ঈমান

প্রকাশকের কথা

কালের বিস্তৃত গর্ভে হারিয়ে-যাওয়া অতীতের রাজা-বাদশাহ্‌দের রাজনৈতিক পরিচয় বহন করাই ইতিহাসের গৌরব। কিন্তু, সমসাময়িক যুগ-চেতনা থাকে সেখানে অনুপস্থিত। যুগের দাবী প্রধানতঃ সাহিত্যেই উচ্চকিত। কবি-সাহিত্যিক-দের নীরব কন্ঠই সেকালের সাহিত্যের পাতায় সোচ্চার। নানান সমস্যা জর্জরিত অপসৃয়মান মোগল সাল্‌তানাতের ক্রান্তিলগ্নে জাতির চিন্তা-ভাবনা প্রকট হয়ে উঠেছে তদানীন্তন যুগের সাহিত্যে। "দীওয়ান-ই-গালিব" তারই প্রতিরূপ। উর্দু ভাষা-সাহিত্যের কাব্য-পরিধিতে পদচারণায় অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার মির্জা গালিব তাঁর বিদগ্ধ মনের কওমী পরিমণ্ডলকে চিত্রিত ক'রে গেছেন এই মহান কাব্যে। ভাষার সীমিত গণ্ডীর বন্ধুর উপত্যকা পেরিয়ে তাঁর চিন্তা-সূত্রপ্রসূত যুগ-জিজ্ঞাসার সন্ধান আমাদের জন্যে সম্ভব ছিলো না। যুগের অন্বেষার অভাবে সেই সম্পদ-সম্ভার আমাদের নাগালের ভেতরে থাকা সত্বেও 'দীওয়ান-ই-গালিব"-এর অবিস্মরণীয় কাব্যরস থেকে আমরা সত্যিই বঞ্চিত ছিলাম। কবি মনিরউদ্দীন ইউসুফ সেই দুরূহ বিষয়কে বাংলায়

অনুবাদ ক'রে সফলতার সাথেই বাংলা-কাব্যা-মোদীদের জন্যে অনবদ্য একটা নতুন সংযোজন উপহার দিয়েছেন। এরই মাধ্যমে আমরা মিলিয়ে নিতে পেরেছি আমাদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাব-নার সাথে সেদিনের সমাজ ও তাদের সমস্যাকে।

"দীওয়ান-ই-গালিব"-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশের গৌরবের হকদার বাংলা একাডেমী। আমরা তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সুযোগে আজ ধন্য। কওমী জীবন-জিজ্ঞাসার প্রেরণা ও চেতনায় "দীওয়ান-ই-গালিব" তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেই অদ্বিতীয়,—নতুন ক'রে কিছু বলার অবকাশ রাখে না। গ্রন্থটা কাব্যোৎসাহী, সন্ধিৎসু পাঠকদের পিপাসা মেটাতে সক্ষম হ'লেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক মনে করবো।

—শেখ ফজলুর রহমান

প্রথম প্রকাশ-প্রসঙ্গ

বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্মকে অনুবাদের মাধ্যমে পরিবেশন করার যে দায়িত্ব বাঙলা একাডেমী গ্রহণ করেছে, 'দীওয়ান-ই-গালিব' তারই অন্তর্গত। আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌র দরবারের কবি। গালিব তাঁর নিজের কালে তো বটেই, আজ পর্যন্তও উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃতি পেয়ে আসছেন। ফারসীতেও তিনি বহু গজল ও কাসীদা রচনা করেছেন এবং তিনি নিজে সেই ফারসী কবিতা-গুলোকে উর্দুর চাইতে মহত্তর বলে গণ্য করতেন। কিন্তু বিগত এক শতাব্দীর পাঠকের বিচারে উর্দু ভাষায় লিখিত দীওয়ান-ই-গালিবই তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি বলে বিবেচিত হয়েছে। সেই দীওয়ান থেকেই নির্ধারিত পঞ্চাশটি গজল ও কাসীদা এই বইতে অনূদিত হয়ে প্রকাশ পেলো। গালিবের

উর্দু গজলগুলোতে ভাষার তির্যক ভঙ্গী ও ভাবের ইঙ্গিতময়তা প্রথমেই চোখে পড়ে। তারপর আর যে-টি পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে সে-টি হোল এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতির শেষ উদ্ভাস খেলা শেষের মতোই যা করুণ ও মনোরম।

ব্যক্তি-মানসের গভীর রঙে রঞ্জিত হয়ে অতীত তার আত্মাকে প্রকাশ করে। তাই নিছক কাব্য-সৌন্দর্য ছাড়াও স্বাধীন ভারতের মুসলিম সংস্কৃতির শেষ প্রকাশ-স্থল বলে দীওয়ান-ই-গালিব মূল্যবান সাহিত্য কীর্তি বলে গণ্য। জনাব মনিরউদ্দীন ইউসুফ আমাদের জন্য গালিবের এই অনুবাদগুলো করেছেন। কয়েকটি অনুবাদ গদ্যে করা হয়েছে।

সৈয়দ আলী আহসান
পরিচালক ঃ বাঙলা একাডেমী

কবি-পরিচিতি

॥ এক ॥

বিশেষজ্ঞদের মতে কাব্যের বড় সমালোচক কাল। এই কালের কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ এক শ্রেষ্ঠ কবি হলেন মীর্জা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব। এক শতাব্দী কাল পরেও কাব্য-রসিকগণ গালিবকে উর্দু কাব্যসাহিত্যের মহত্তম চূড়া বলে গণ্য করেন। জীবিতকালে কবিদের স্বীকৃতি হয় না বলে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু গালিব তাঁর জীবিত কালেই সারা ভারতে মহৎ কবি-প্রতিভা বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তবু চাঁদে কলঙ্কের মতো কবি-মনে যে একটা দাগ লেগেছিল, তাকে শাহী মহলের প্রচলিত ঈর্ষামূলক ষড়যন্ত্রের ফল বলে গণ্য করা যায়। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ যফরের সভা-কবিদের মধ্যে গালিবের স্থান সর্বোচ্চে ছিল না। লালাকেল্লায় বাদশার কবি-গুরু যওকই কবি-সম্রাট বলে অভিনন্দিত হতেন। এই নিয়ে কবিকে অনেক মনোবেদনা সহ্য করতে হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঈর্ষাঘাতে জর্জরিত গালিবকে কবিতা লিখে স্বীকারোক্তি নিবেদন করতে হয়েছে যে, বাদশার ওস্তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা তাঁর সাজে না! তাছাড়া এও বলতে হয়েছে যে, কবিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কই বা কি?—কাব্য লেখায় তাঁর গর্ব করার কিছু নেই—তিনি তো পুরুষপরম্পরায় সৈনিক ইত্যাদি (৪৮ নং কবিতা দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু নিয়তি গালিবকে লালকেল্লার শাহী দরবারেই আবদ্ধ করে রাখেনি। ইতিহাসের এমন এক করুণ অধ্যায়ে সে তাঁকে নিক্ষেপ

করেছিল, যার সঙ্গে পাতাঝরা হেমন্তেরই শুধু তুলনা হয়। কবিকে সাত শো বছরের মুসলিম শাসন-সংস্কৃতির অন্তিম দিনগুলোর সাক্ষী হতে হয়েছিল। দিল্লীর 'মহাশ্মশানে' দাঁড়িয়ে কলজেয় হাত রেখে তাঁকে বলতে হয়েছিল ঃ

লালা ও গোলাপে রমণীয় রূপ
সব কি প্রকাশ পেলো ?
কতো সে মোহন মূর্তি না জানি
গোপনেই রয়ে গেলো।
আমারো স্মরণে ভেসে উঠে আজ
অতীত সুখের স্মৃতি
আহা, কোথা গেলো আসর-উজল
চিত্র-রঙীন গীতি।
(২৯ নং কবিতা দ্রষ্টব্য)

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভাঙন যখন সম্পূর্ণ হোল, তখন শাহী দরবারের অতীত দুঃখ ও গ্লানি কবি যে শুধু বিস্মৃতই হয়েছিলেন তা নয়, বেলাশেষের অস্তলালিমার করুণ-মধুর স্মৃতি তাঁর বাকী জীবনকে অস্থির ও ব্যথিত করেই রেখেছিল। সেই ব্যথা ও অস্থিরতা তাঁর কবিতায় কত না প্রচ্ছন্ন রূপকের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। যে-সংস্কৃতি একদিন মূল্যবান শ্বেত মর্মরের কারুকর্মে নিজেকে জাহির করেছিল, সেই সংস্কৃতিই যেন দুদিনে গালিবের বেদনাময় গজল-গানে তার শেষ কান্না কেঁদে গেছে।

সিপাহী বিদ্রোহের পরেও কবি অনেক দিন বেঁচে ছিলেন। দিল্লীর অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলোপ ও তাঁদের জায়গায় সুদখোর মহাজন সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি তাঁর বিভিন্ন পত্রে অতি করুণ ভাষায় চিত্রিত হয়ে আছে। একটি পত্রে গালিব লিখেন, 'সাম্রাজ্যের দীপ নিভে গেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত। এখনো যারা বেঁচে আছে তাদের মধ্যে শত শত কারাগারে। প্রাণ নিয়েই শুধু বেঁচে আছে মানুষ, জীবনের শক্তি তাদের মধ্যে নেই। মুসলমান আমীরদের মধ্যে নওয়াব হাসান আলী খাঁ, নওয়াব হামিদ আলি খাঁ ও আহসানুল্লাহ খাঁ ছাড়া অন্যদের অবস্থা এমন যে, যদি রুটি জোটে তো কাপড় জোটে না।

এখানকার অস্তিত্বে নিয়ত ভূমিকম্প হচ্ছে। জানি না কোথায় যাব? সুদখোর মহাজনরা ছাড়া এখানে ধনবান আর কেউ নেই।"

কবির এই অঙ্কিত চিত্র সেদিন শুধু দিল্লীর পক্ষেই সত্য ছিল না। সারা পাক-ভারতেই মুসলমানদের অবস্থা এমন শোচনীয় ছিল।

ইংরাজের সৌজন্য ও সহযোগিতায় বাংলার হিন্দুদের মধ্যে তখন রেনেসাঁসের জোয়ার এসেছে। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের সাহিত্যকর্মে জীবনের জলতরঙ্গ বাজছে। আর এদিকে মুসলিমভারতের জীবনে এসেছে ভয়ানক দুর্দিন। বন্দী ভারতাত্মার ক্রন্দন সেদিন গালিবেরই কবিতায় রূপলাভ করেছিল। গালিবই হয়েছিলেন উনিশ শতকের নির্যাতিত ভারতাত্মার দর্পণ। হিন্দুবাংলার রচিত সাহিত্যে তার যন্ত্রণা চীৎকার অনুপস্থিত।

গালিবের পূর্বপুরুষগণ জাতিতে তুর্কী ছিলেন। সম্রাট শাহ আলমের রাজত্বকালে পিতামহ মীর্জা কুতান বেগ খাঁ দিল্লীতে আগমন করেন। মোগল-সাম্রাজ্যের গৌরব-সূর্য তখন অস্তমুখী। কিন্তু বিদেশী আশ্রয়-প্রত্যাশীর গুণের আদর তখনো আগের মতোই ছিল। কুতান বেগ রাজকার্যে গৃহীত হয়েছিলেন। তাঁকে বেতন বাবত দিল্লীর নিকটবর্তী পাহাসু নামে এক পরগনা জায়গীর দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। পিতামহের মৃত্যুর পর সেই জায়গীর বাজেয়াপ্ত হয়ে গেলে গালিবের পিতা আবদুল্লাহ্ বেগ খাঁ লক্ষ্ণৌর নওয়াব আসফুদ্দৌলার দরবারে গিয়ে চাকরি গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে, দিল্লীর বাদশাহ তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃত্তিধারী। আবদুল্লাহ্ বেগ খাঁ পরে হায়দ্রাবাদে নিযামের অধীনে তিন শো ঘোড়সওয়ারের সেনাপতিত্ব লাভ করে কয়েক বছর সেখানে অবস্থান করেন ও গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করায় হায়দ্রাবাদ থেকে বিতাড়িত হন। হায়দ্রাবাদ ছেড়ে তিনি আলোয়ারের রাজা বখ্তাওয়ার সিংহের অধীনে সেনাপতির কাজ পান ও অনতিকাল পরেই ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে এক যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেন। গালিবের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। পিতার মৃত্যুর পর গালিবের লালন-পালন হয় পিতৃব্য নাসিরুল্লাহ্ বেগের হাতে।

নাসিরুল্লাহ্ খাঁ মারহাট্টাদের অধীনে আগ্রার সুবাদার ছিলেন। পরে ইংরাজ কর্তৃক আগ্রা অধিকৃত হলে তিনি সুবাদারের পদ থেকে

ব্রিগেডিয়ারের পদলাভ করেন ও সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহের জন্য লক্ষাধিক টাকার এক জায়গীর পান। কিন্তু পিতৃব্যের স্নেহের ছায়াও অতি অল্পকাল পরেই তাঁর মাথার উপর থেকে উঠে যায়। নাসিরুল্লাহ্ বেগ খাঁ এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করেন। গালিবের বয়স তখন নয় বছর।

গালিবের জন্ম তারিখ সম্পর্কে সকল চরিতকারই একমত। তাঁদের মতে ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর বুধবার দিন আগ্রায় মাতুলালয়ে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে নিজের জন্মতারিখ বলতে গিয়ে গালিব স্বীয় দুঃখপূর্ণ নিয়তির দিকে ইঙ্গিত করে মন্তব্য করেছিলেন, "রীতি আছে, জলমাটির দুনিয়াতে যে পাপ করে সে আত্মার জগতে গিয়ে শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু এমনও হয়েছে যে, আত্মার জগতের গুনাহ্গার দুনিয়াতে প্রেরিত হয় শাস্তিভোগের জন্য। সেই মতে ১২১২ হিজরীর ৮ই রজব তারিখে শাস্তিভোগের জন্য আমি দুনিয়াতে প্রেরিত হই।"

গালিব তাঁর বংশগত আভিজাত্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ও গর্বিত ছিলেন। একবার তিনি নিজের বংশপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি তুর্কী জাতি সম্ভূত। আমার বংশাবলী আফ্রাসিয়াব ও পিশাঙ্গের (প্রাচীন তুরানের বাদশাহ) সঙ্গে যুক্ত।"

আভিজাত্যের এই গর্ববোধ কবিকে সারাজীবন অসুখী করে রেখেছিল। জীবনের কোন অবস্থাকেই তিনি নিজের গৌরবময় অতীতের সঙ্গে সমন্বিত বলে ভাবতে পারেননি। পিতা ও পিতৃব্যের মৃত্যুর পর মাতামহের সমৃদ্ধ সংসারে নিতান্ত সুখভোগের মধ্যেও তিনি হীনতাভাবে জর্জরিত হয়েছেন বার বার।

নাসিরুল্লাহ্ বেগের মৃত্যুর পর গালিব জন্মভূমি আগ্রায়ই তাঁর মাতামহের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হতে থাকেন। মাতামহ ছিলেন আগ্রার অভিজাত সম্প্রদায়ের এক গণ্যমান্য ব্যক্তি।

গালিবের বাল্যশিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে যেরূপ শিক্ষিত ও অভিজাত পিতামাতার সন্তান তিনি ছিলেন, তাতে তাঁর বাল্যের শিক্ষা যে উপেক্ষিত হয়নি, তা অনুমান করা শক্ত নয়। হালী প্রভৃতি চরিতকারদের সম্মিলিত অভিমত এই যে, গালিবের

বুদ্ধিমতি মাতা ইজ্জতুন্নেসা বেগম পুত্রের বাল্যশিক্ষার ভার তুলে দিয়েছিলেন আগ্রার সুযোগ্য আলিম মৌলবী মুহাম্মদ মুআজ্জমের হাতে।

এই বাল্যশিক্ষার কালেই গালিবের জীবনে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে যাঁর প্রভাব তাঁর সারা জীবনের উপরই লক্ষ্য করা যায়। সেই ব্যক্তি ছিলেন ইরানের অগ্নি-উপাসক সম্প্রদায়ের এক নও-মুসলিম। তাঁর পূর্ব নাম ছিল হারমজ্‌দ। মর্মর-স্বপ্ন তাজমহল দেখার অভিপ্রায়ে তিনি আগ্রায় এসেছিলেন। বছর দুই সেখানে অবস্থান করে আবার আকস্মিক ভাবে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলেন তা জানা যায় না। এই নও-মুসলিম অগ্নি-উপাসক মোল্লা আবদুস্ সামাদ ছিলেন ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক ফারসী সাহিত্যের এক বিরাট পণ্ডিত। তাঁরই নির্দেশে গালিব ফারসী সাহিত্যের রত্ন-ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছিলেন। পরবর্তী কালে পরিণত বয়সে শিয়া মতবাদের প্রতি গালিবের যে পক্ষপাত দেখা যায়, মোল্লা আবদুস সামাদের সাহচর্যেরই পরিণতি সেটি। নচেৎ গালিবের পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলই ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। তদুপরি এই অপরিচিতি ইরানীর শিক্ষায়ই গালিব জরোয়েস্ট্রীয় মতবাদ সম্পর্কেও গভীর জ্ঞান লাভ করেছিলেন, যা 'কাতিয়ে বুরহান' নামক গ্রন্থে তাঁর বিশ্বাসের অঙ্গীভূত হয়েছে বলে দেখতে পাই।

এই হারমজ্‌দ সম্পর্কে গালিব লিখেন, "স্বীয় প্রকৃতির তাগিদেই বাল্যকাল থেকে আমি ফারসীর প্রতি অনুরক্ত ছিলাম। আকাঙ্খা করতাম, অভিধানের চেয়ে আরো বেশী কিছু ঐশ্বর্যের যদি সন্ধান পেতাম! আমার আশা পূর্ণ হয়েছিল। পারস্যের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে এক ব্যক্তি হঠাৎ এখানে আগমন করেছিলেন ও আকবরাবাদে (আগ্রায়) গরীবের কুটীরে বছর দুই অবস্থান করেছিলেন। আমি তাঁরই কাছ থেকে ফারসী ভাষার জ্ঞান ও তার সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ অবগত হয়েছিলাম। বর্তমানে আমি এ বিষয়ে বিশেষ জানাশোনার গর্ব করতে পারি।"

হালীর মতে হারমজ্‌দ গালিবের সঙ্গে দিল্লী পর্যন্ত গমন করেছিলেন। গালিব ফারসীতে এতখানি পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন যে, একাধিক পত্রে তিনি গর্ব করে বলেছেন, "আমি ফারসীর পণ্ডিত" —"ফারসীর মানদণ্ড আমারই হাতে রয়েছে।"

জানা যায় যে, গালিব তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষ বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। আরবী ভাষায়ও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল, কিন্তু আরবীর পণ্ডিত বলে তিনি কখনো দাবী করেননি। গালিব লিখেন, "আমি আরবীর পণ্ডিত নই, কিন্তু তাই বলে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞও নই। ওই ভাষার অভিধান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের দাবী আমি করতে পারি না। ... ফারসী? ... হ্যাঁ, ফারসীর ব্যাকরণ ও সেই ভাষার রীতিনীতি সম্পর্কে আমি এতখানি ওয়াকিফহাল ও তার প্রকৃতি আমার প্রকৃতির সঙ্গে এতখানি মিলে-মিশে রয়েছে যে, তা যেন ইস্পাতের সঙ্গে তার কাঠিন্যের অনুরূপ। পারস্যবাসী ও আমার মধ্যে শুধু এতটুকু তফাৎ রয়েছে যে, তারা ইরানে জন্মগ্রহণ করেছে, আর আমি হিন্দুস্তানে ... এবং তারা আমার পূর্ববর্তী।"

শেষ পংক্তিতে গালিব ক্লাসিক্যাল যুগের শ্রেষ্ঠ ফারসী কবিদের সঙ্গে নিজের একাত্মতার কথা ঘোষণা করেছেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রে গালিবের দক্ষতা উল্লেখযোগ্য। তিনি যথারীতি চিকিৎসক না হলেও, এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা নগণ্য ছিল না; তার প্রমাণ এই যে, একদা তিনি নওয়াব কালব-ই-আলীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেছিলেন ও দুষ্প্রাপ্য রাসায়নিক বস্তু সমূহের সহযোগে তাঁকে ঔষধ তৈরী করে দিয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি নওয়াবকে লিখে-ছিলেন, "আমি চিকিৎসক নই, কিন্তু এ-বিষয়ে অভিজ্ঞ বটে।"

জ্যোতিষ বিদ্যাও গালিবের চিত্তবিনোদনের এক বিশেষ সামগ্রী ছিল ও সে-বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত মতামতও শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হোত। ১৮৫৮ সালে এক ধূমকেতুর আবির্ভাবে গালিব মন্তব্য করেছিলেন যে, এ-সকল বিষয়ের কারণ অনুসন্ধানের ব্যাপারে জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার যোগাযোগ লক্ষ্য করবার মতো। ধূমকেতুর এই আবির্ভাব দেশের বরবাদী ও ধ্বংসই সূচিত করছে। গালিবের মন ও মানসের এই বহুমুখী প্রবণতা এই কথাই প্রমাণ করে যে, বাল্যে ও কৈশোরে তিনি যে শিক্ষা পেয়েছিলেন, তা কোন ক্রমেই তৎকালীন মান অনুযায়ী ন্যূন ছিল না।

যৌবনকাল পর্যন্ত গালিব মাতুলালয়েই অতি প্রাচুর্যের মধ্যে বর্ধিত হন। মাতুলালয়ের এই স্নেহ-আদরের মধ্যে সহজেই তিনি উচ্ছৃঙ্খল

হয়ে উঠেছিলেন ও যৌবনারম্ভে বাল্যের এই উচ্ছৃঙ্খলতা নিরঙ্কুশ বিলাসের মধ্যে স্বীয় স্বার্থকতা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই সময় দুশ্চরিত্র বন্ধু-বান্ধবেরও তাঁর অভাব হয়নি। কখনো কখনো তিনি তাদের সঙ্গে সতরঞ্জ খেলা ও সুরাপানে মত্ত রজনী যাপন করতেন বলে জানা যায়। এই সব বন্ধুদের উৎসাহে ও প্ররোচনায় গালিব প্রেমের উচ্ছলতায় নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এই সময়ের ঘটনাবলীর বিস্তারিত কোন বিবরণ জানা যায় না। তবে পরিণত বয়সে যৌবনারম্ভের সেই প্রমত্ত দিনগুলোর স্মৃতি যে কবিকে উতলা করত, তার প্রমাণ তাঁর নিজের লেখায়ই রয়েছে। গালিব তাঁর এক বন্ধুর কাছে সেদিনের সেই স্মৃতিকে উপলক্ষ্য করে লিখেন, "ভাই, মোগল-তনয়ই হয় বিস্ময়কর প্রকৃতির। যার জন্য সে মন-প্রাণ উৎসর্গ করে, তাকে নিজের হাতেই সংহার করে রেখে দেয়। আমিও মোগল-তনয়। আমিও এক ডোমনীকে সারা জীবনের জন্য মেরে রেখেছি। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরের ঘটনা। এতদিনে সেই পল্লী কোথায় হারিয়ে গেছে; সেই প্রেম-কৌশলও বিস্মৃত হয়েছি। কিন্তু এখনো রাতে-বিরাতে সেই জীবন-ভঙ্গী মনে পড়ে। তার (ডোমনীর) মৃত্যু (প্রণয়-মৃত্যু) জীবনে কখনো ভুলতে পারব না।"

কবির লিপিকার এই সংযত ও রুচিপূর্ণ ভাষার অন্তরালে চল্লিশ বছর আগেকার যে অগ্নি-গর্ভ দিনগুলো আত্মগোপন করে আছে, তাদের জ্বালা আমরা আন্দাজে অনুভব করতে পারি এবং এইরূপ অবৈধ প্রণয়ের লীলা-চাঞ্চল্য, এই সুরাপান ও এইরূপ বন্ধুবাৎসল্যই যে কবিকে সর্বদা অভাবগ্রস্থ করে রাখত তাও বুঝতে পারি।

জানা যায় যে, এই সময় পারিবারিক সুনাম-যশের উপর নির্ভর করে গালিব যদৃচ্ছ ধার চেয়ে বেড়াতেন ও তা পেতেনও। যৌবনের এই অমিতব্যয়িতা ও ধার করার অভ্যাস কবি কখনো ছাড়তে পারেননি। পরিণত বয়সে এই বদভ্যাসের জন্য তাঁকে যে কি নিদারুণ দুশ্চিন্তা ও অপমান পোহাতে হয়েছে, তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাব।

এই সব উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রে প্রথম থেকেই যে সরলতা বিকাশ লাভ করেছিল, আজীবন তা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা ও রসবোধের মতো অকপটতাও তাঁর চরিত্রের এক বিশেষ গুণ ছিল। প্রকৃত সৈনিকের মতো তিনি ছিলেন সর্বদা

সরল ও স্পষ্টভাষী। নিজের মতামত অত্যন্ত সাহসের সঙ্গেই তিনি ব্যক্ত করতেন। কে তাতে কতখানি ক্ষুণ্ণ হোল, নিজেরই বা কতটুকু ক্ষতি হোল সে সব বিচার কোন দিন তাঁর ভাবনার বিষয়ীভূত হয়নি।

কিন্তু মাতুলালয়ের এই সুখভোগ তাঁর ভাগ্যে বেশীদিন সইল না। যৌবনারম্ভেই, আমরা দেখতে পাই, গালিব জীবন ও জীবিকার অন্বেষণে দিল্লীর পথ ধরেছিলেন। কেন যে তিনি মাতুলালয় ছেড়ে গিয়েছিলেন, তা জানা যায় না। সম্ভবতঃ মাতামহের মৃত্যুর পর মাতুলদের সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হয়নি—অথবা অপরের আশ্রয়ে প্রাণ ধারণের দীনতা অনুভূতি-প্রবণ যুবকের আত্মসম্মানকে আঘাত করেছিল।

গালিবের এই দিল্লী-হিজরতের সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে সিপাহী বিদ্রোহের পাঁচ বছর পরে ১৮৬২ সালের ০৬ই ফেব্রুয়ারীতে লিখিত একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, উনপঞ্চাশ বছর আগে তিনি দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এসেছিলেন। চিঠির মর্ম নিম্নরূপ ঃ

"প্রিয় বন্ধু, এ সেই দিল্লী নয়, যেখানে তুমি জন্ম নিয়েছিলে, সেই দিল্লী নয়, যেখানে তুমি শিক্ষা হাসিল করেছিলে। এ সেই দিল্লী নয়, যেখানে শাবান বেগের হাবেলীতে তুমি আমার কাছে পড়তে আসতে। এ সেই দিল্লী নয়, যেখানে সাত বছর বয়স থেকে আসা-যাওয়া করতাম। এ সেই দিল্লীও নয়, যেখানে উনপঞ্চাশ বছর ধরে স্থায়ী-ভাবে বসবাস করছি।"

এই চিঠির মর্মানুসারে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের কোন এক সময়ে গালিব দিল্লীতে এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ষোল কি সতর বছর।

দিল্লীতে আসার দু'বছর আগে অল্প বয়সেই গালিবের বিয়ে হয়েছিল। সম্ভবতঃ স্নেহময়ী জননী পুত্রের চরিত্র সংশোধন ও তাঁকে সংযত করার অভিপ্রায়েই এই বিয়ে দিয়েছিলেন। গালিবের পত্নীর নাম ছিল উমরাও বেগম। তিনি দিল্লীর নওয়াব ইলাহী বখ্‌শ্‌ খানের কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। ইলাহী বখ্‌স নিজেও ছিলেন নামকরা উর্দু কবি। রাজ-কবি যওক ছিলেন তাঁর বন্ধু ও কবি-গুরু। তিনি তাঁর কবিতায় 'মারূফ' ভণিতা করতেন।

কিন্তু বিবাহ গালিবের তারুণ্যের উচ্ছৃঙ্খলতাকে এতটুকু সংযমিত করতে পারেনি। বরং সারা জীবনই তিনি বিবাহিত জীবনকে

'শৃঙ্খল,' 'অসহ ভার' ও চিরকারাগার' বলে অভিহিত করে গেছেন। উমরাও বেগমের রূপ, গুণ কিছুই কবির বাধন-ছেঁড়া উদ্দাম জীবনকে পারিবারিক সুখ-শান্তির দিকে টানতে পারেনি। বিবাহিত জীবনের প্রতি কবির এই অসন্তোষ ও তিক্ততা তাঁর কবিতায় অন্তঃস্রোতের মতো প্রবাহিত (২৬ নং ও ৩২ নং কবিতা দ্রষ্টব্য)। তাই এ সম্পর্কে কবির মতামত যে সব চিঠিপত্রে ব্যক্ত হয়েছে তার কয়েকটি নীচে উদ্ধৃত হল।

দাম্পত্য জীবনের ত্রয়োদশ বর্ষে লিখিত এক পত্র ঃ "তের বছর কারাগারে কাটিয়েছি। ১২২৫ হিজরীর ৭ই রজব আমার জন্য চিরকারাগারের আদেশ হয়েছিল। এক শৃঙ্খল আমার পায়ে পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং দিল্লী শহরকে আমার কারাগাররূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। অনেক বছর পরে সেখান থেকে পালিয়েছিলাম। তিন বছর ধরে পূবের শহরে ঘুরে ফিরেছি। তারপর আমাকে কলিকাতা থেকে ধরে এনে আবার সেই কয়েদখানায় পুরে রাখা হয়েছে। যখন দেখা গেল যে কয়েদী পলায়নপর, তখন তার হাতেও হাতকড়ি পরিয়ে দেওয়া হল। সেই থেকে পদদ্বয় শিকলের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত ও হাত হাতকড়িতে জখমী হয়ে গেছে।"

প্রকৃত পক্ষে গালিবের চরিত্র দাম্পত্য বন্ধনের একেবারেই উপযোগী ছিল না। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে কবির এক শিষ্য দিল্লীতে কলেরার মড়ক সম্বন্ধে জানতে চাইলে কবি লিখেন ঃ

"কোথায় সেই মড়ক যে, আমি লিখব তা কমেছে বা বেড়েছে ? একজন ছেষট্টি বছরের পুরুষ, আরেকজন চৌষট্টি বছরের নারী— দু'জনের একজনও যদি মারা যেত, তবে বুঝতাম হাঁ, মড়ক এসেছিল। মড়ককে ধিক !"

বন্ধু মেহেরের পত্নী চুন্নাজানের মৃত্যুতে কবি লিখেন ঃ

"পয়ষট্টি বছর বয়েস। পঞ্চাশ বছর তো রঙ্ ও গন্ধের দুনিয়া উপভোগ করেছি। যৌবনারম্ভে এক গুরু আমাকে উপদেশ ছলে বলেছিলেন, 'সংযম ও ধর্মজীবন তোমার জন্য নেই, পাপ ও ভোগে তোমার বাধা নেই ; খাও, পান কর ও আনন্দ কর ; কিন্তু মনে রেখ, মধুমক্ষিকা না হয়ে শর্করার মাছি হওয়াই সুবিধাজনক'—এই উপদেশের উপর আমার বরাবর আচরণ রয়েছে। কারো মৃত্যুর জন্য

সে-ই শোক করুক, যে নিজে কোনদিন মরবে না। মুক্তির জন্য আল্লাহর শুকুর কর, (স্ত্রীর) মৃত্যুর জন্য দুঃখ করো না। তবে এরূপ বন্ধনে যদি সন্তুষ্টই থেকে থাক, তবে চুন্নাজানের বদলে একজন মুন্নাজান করে নিলেই চলবে।"

অদ্ভুত সান্ত্বনা!

কিন্তু এসব সত্ত্বেও কবি সাত-সাতটি সন্তানের পিতা হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি এক চিঠিতে লিখেন:

"চুয়াত্তর বছর বয়সে সাতটি সন্তানের পিতা হয়েছি—পুত্র ও কন্যা উভয়ই। কিন্তু কারো বয়স পনর মাসের বেশী হয়নি।"

আগ্রায় থাকা কালেই গালিবের কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল। প্রথমত, তিনি মাতৃভাষা উর্দুতেই কবিতা লিখতে শুরু করেন। তারপর ফারসীর প্রতি তাঁর অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। হায়মজ্দের সাহচর্য তাঁর সেই অনুরাগকে আরো গভীর রঙে রঞ্জিত করে তোলে। তিনি তখন প্রায় উর্দু লেখা ছেড়েই দিয়েছিলেন।

কিন্তু দিল্লীতে আসার পর থেকে আবার তিনি উর্দু লেখার দিকে মন দেন। এই সময় সেখানে উর্দু ভাষা চর্চায় এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল। রাজদরবারে ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সর্বত্র ফারসী উপেক্ষিত হচ্ছিল আর তার জায়গায় স্থায়ী আসন করে নিচ্ছিল উর্দু। গালিব বাস্তবের এই দাবীকে অস্বীকার করতে পারেননি। কিন্তু তাই বলে ফারসীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চুকে যায়নি। বরং একথা বলা যায় যে, দিল্লী ও হিন্দুস্থানের উদাসীনতা সত্ত্বেও গালিব সারা জীবনই ফারসীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

আগেই বলেছি যে, গালিবের শ্বশুর ছিলেন দিল্লীর এক গণ্যমান্য আমীর। তিনি কবিও ছিলেন। যুবরাজ বাহাদুর শাহ্‌র গুরু যওক তাঁরও কবিগুরু ছিলেন। শ্বশুরালয়েই কবি যওকের সঙ্গে গালিবের পরিচয় হয়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রথম দিনেই যওক গালিবের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেন। গালিবও যওককে সেদিন থেকেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেননি। একের প্রতি অন্যের এই বিরূপতা আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। আমরা জানি, পরবর্তী কালে গালিব যখন শাহী দরবারে গৃহীত হন, তখন যওকের ঈর্ষা তাঁর জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল।

গালিব দিল্লীতে এসে প্রথম যে বাড়ীটি ভাড়া নিয়েছিলেন সেটির নাম ছিল 'শাবান খাঁর হাবেলী'। এ হাবেলীতে যদিও তিনি দীর্ঘকাল বসবাস করেছিলেন, তবু দিল্লীতে এই-ই তাঁর একমাত্র বাসস্থান ছিল না। ছাপ্পান্ন বছরের দিল্লীবাসের মধ্যে পর পর ছয়টি বাড়ীতে তাঁকে ভাড়াটে হিসেবে থাকতে হয়েছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যেও কবি নিজের কোন বাড়ী করে উঠতে পারেননি। যৌবনের রঙীন আশায় যে আর্থিক সমৃদ্ধির স্বপ্ন নিয়ে তিনি হিন্দুস্তানের রাজধানী দিল্লীর পথ ধরেছিলেন, তাঁর সেই স্বপ্ন কোন দিন বাস্তবে পরিণত হয়নি। তাঁর আর্থিক অবস্থা কোন দিনই স্বচ্ছলতার সীমায় পৌঁছতে পারেনি।

কিন্তু ভাগ্যের এইসব পরিহাস সত্ত্বেও কবির জনপ্রিয়তা দিল্লীতে কতটুকু ছিল, নীচের চিঠি দুটো থেকে তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে।

গালিব তাঁর এক দূরবর্তী বন্ধুকে লিখছেন ঃ

"এত সব কি লিখেন ? শুধু শহরের নাম ও আমার নামই যথেষ্ট। হিন্দুস্তানে সবাই দিল্লীকে জানে, আর দিল্লীর সবাই আমাকে চেনে।"

অন্য এক চিঠিতে ঃ

"আপনি শুধু দিল্লীর নাম ও আমার নাম লিখে চিঠি ছেড়ে দিন। চিঠি পৌঁছার দায়িত্ব আমার রইল।"

যদিও এই চিঠি দুটো অনেক পরের লেখা, তবু দিল্লীতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যে কবি সেখানকার অভিজাত সম্প্রদায়ে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ সকল চরিতকারই উপস্থিত করেছেন।

কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়ে এই মেলামেশা যে অভাবগ্রস্ত কবির জন্য শুভ হয়নি, তা এক রকম জোর করেই বলা চলে। অমিত-ব্যয়িতার অভ্যাস তো আগে থেকেই ছিল; তার উপর বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন কবিকে সর্বদাই তাঁর সঙ্গতির বাইরে পা রাখতে প্ররোচিত করত। তাই পিতৃব্যের ওয়ারিসী বার্ষিক দেড় হাজার টাকায় তাঁর কিছুতেই চলত না। ঋণের উপর নির্ভর করতে হত।

দিল্লীতে আসার পর থেকেই তিনি ইংরাজ সরকারের কাছে পিতৃব্য ও পিতামহের জায়গীরের দাবী নিয়ে বারবার আরজী পেশ করেছেন। এবং এজন্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে কলকাতাও সফর

করতে হয়েছে। এই কলকাতা সফর তাঁর জন্য অনেক দিক থেকেই ফলপ্রসূ হয়েছিল। বুকভরা আশা নিয়ে ১৮২৬ সালে গালিব কলকাতার উদ্দেশে দিল্লী ত্যাগ করেন। পথে কয়েক মাসের জন্য তাঁকে লক্ষ্ণৌতে কাটাতে হয়েছিল। এই সময় লক্ষ্ণৌর নওয়াব ছিলেন নাসীরুদ্দীন হায়দর। লক্ষ্ণৌর তৎকালীন সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কবি পরে লিখেছিলেন ঃ

"লক্ষ্ণৌ সম্পর্কে আর কি বলব! সেটি হিন্দুস্তানের বাগদাদ ছিল। আল্লাহ আল্লাহ! লক্ষ্ণৌর সরকার ছিল ধনীস্রষ্টা। যেই সেখানে নির্ধন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে, সে-ই ধনী হয়ে উঠেছে।"

লক্ষ্ণৌ থেকে কবি বেনারসে এসে উপস্থিত হন। বেনারসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে তিনি এতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তার উপর একখানা ফারসী কাসীদা রচনা করে ফেলেন। সেই কাসীদার নাম ছিল 'চেরাগে দায়র' বা 'মন্দিরের প্রদীপ'।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কবি কলকাতা এসে পৌঁছান ও সেই দিনই মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় সিমলা বাজারে এক বাড়ী নেন। বাড়ীটি কবির খুব পছন্দ হয়েছিল। বাড়ীটি যেমন বড় ছিল তার সামনের আঙিনাটিও ছিল তেমনি প্রশস্ত।

কবি কলকাতায় প্রায় দু'বছর অবস্থান করেন। সরকারের কাছে তিনি যে পেন্‌শন ও জায়গীর উদ্ধারের আরজী নিয়ে এসেছিলেন তা নামঞ্জুর হয়েছিল। অর্থাৎ যে আশা নিয়ে দিল্লী থেকে তিনি বেরিয়েছিলেন, সে আশা পূর্ণ হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবির কলকাতা সফর অন্য দিক থেকে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

এই সফরে গালিবের দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত হয়েছিল ভারতের পূর্বাঞ্চল, যা তখন বহু কারণেই বিশেষত্বের দাবী করতে পারত। কলকাতায় তখন ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা তার প্রাথমিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের যুগ অতিক্রম করে মনোমুগ্ধকর ফুল-ফসল ফলাতে শুরু করেছে। গালিবের তীক্ষ্ণ মননে ও অনুভূতিপরায়ণ আত্মায় সেই নব-সূর্যের আলোকপাত হয়েছিল। কলকাতার হিন্দুদের দ্বারা তখন বাংলা সাহিত্যে উজ্জীবনের আয়োজন চলেছে। গালিব তা থেকে প্রেরণা আহরণ করেছিলেন। গালিবকে মুসলিম যুগের শেষ ক্লাসিকাল কবি ও আধুনিক যুগের নকীব বলে উল্লেখ করা

হয়। আমাদের বিশ্বাস, আধুনিকতার যে ছাপ গালিবের কবিতায় দৃষ্ট হয়, তাতে তাঁর কলকাতা সফরের অভিজ্ঞতার অংশ নগণ্য নয়।

আমরা আগে বলেছি যে, গালিবের কাব্যে রক্তাক্ত ভারতাত্মার ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছে। মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন ও মুসলিম সংস্কৃতির অবক্ষয়ের নিদারুণ বেদনা তাঁর কবিতায় অমারাত্রির গম্ভীরতাকে প্রতিফলিত করেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সিপাহীবিদ্রোহের ঘোলাটে জলে তাঁকে অবগাহন করতে দেখা যায়নি। আমাদের মনে হয়, এতেও তাঁর কলকাতা সফরের অভিজ্ঞতাই কার্যকর রয়েছে। গালিব কলকাতায় দেখে এসেছিলেন জীবনের এক নব-দিগন্ত বিস্তার, ডিকাডেন্ট ভারতের জীর্ণ শাখায় তা একদিন নতুন শক্তি দিবে,—এ বিশ্বাস তখন থেকেই তাঁর মনে সঞ্চারিত হয়েছিল। তাই সিপাহী বিদ্রোহের কয়েক বছর আগেই মোগল সাম্রাজ্যের দীপ নির্বাণের ভবিষ্যদ্বাণী তিনি উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন। "তৈমুর বংশীয় শাহ্‌জাদাগণের আয়োজিত মুশায়েরায়' যোগদানের আগ্রহ তাই কবির মধ্যে ছিল না।

কলকাতা সফরের পরে দিল্লীতেও এই নতুনের হাওয়া কবি সারা গায়ে অনুভব করেছিলেন। তাই সমাজ অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে এলেও উর্দু সাহিত্যে তখন জীবনের রং লেগেছিল। সওদা ও মীর তকীর পর থেকে উর্দু কবিতায় যে গতানুগতিকতা, বাক্‌-সর্বস্বতা, তুচ্ছতা ও সামাজিক উদাসীনতা প্রসার লাভ করছিল, গালিবের মধ্যে তার অবসান হল। উর্দু কবিতা তার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ ভঙ্গীটি খুঁজে পেল ও সমাজ-জীবনের রক্তাক্ত রূপটি সাহিত্যে প্রতিফলিত করল। এমন দুদিনেও দিল্লীতে তখন যে সব জ্ঞানী, গুণীর সমাবেশ হয়েছিল, তার মধ্যে আমরা একটা নবযুগের আয়োজনের আভাস পাই। মওলানা আলতাফ হোসেন হালী তখনকার দিল্লীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

"ভাগ্যগুণে তখন দিল্লীতে এমন সব গুণী ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল যাঁদের সাহচর্য ও মেলামেশা আকবর ও শাহ্‌জাহানের যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দিত।...... যখন আমি দিল্লীতে যাই,

তখন যদিও সেই কাননে পাতা ঝরা শুরু হয়ে গেছে কতিপয় ব্যক্তি দিল্লী ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন ও কতক লোক পরলোক গমন করেছিলেন, তথাপি তখনো যাঁরা বেঁচে ছিলেন ও যাঁদেরকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তাঁরা এমনই মহিমান্বিত ছিলেন যে, কেবল দিল্লীতে নয়, সারা হিন্দুস্তানের ভূমি থেকে তেমন লোক আর জন্মাতে দেখা যায়নি। কারণ, তাঁরা যে ছাঁচে ঢালা ছিলেন, সেই ছাঁচই আজ বদলে গেছে এবং যে হাওয়ায় তাঁদের বিকাশ লাভ ঘটেছিল, সে হাওয়াই পাল্টে গেছে।"

১৮২৯ খৃীষ্টাব্দে গালিব কলকাতা থেকে দিল্লী ফিরে আসেন। ফারসী লেখা আগের মত চললেও এখন থেকে তিনি উর্দুর দিকেই বেশী মনোযোগ দিতে শুরু করেন। এই সময় তাঁর কবিখ্যাতি সারা ভারতময় ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু তাঁর কবি-যশের সৌরভ যতই বিস্তার লাভ করুক, গালিবের ভাগ্যে সুখ-শান্তি লাভ কখনো ঘটেনি। তাঁর আর্থিক অভাব ও পারিবারিক অশান্তি চিরদিনই অব্যাহত ছিল।

এই সময় দিল্লী কলেজের ফারসী ভাষার অধ্যাপক পদের প্রস্তাব তাঁকে দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর অদ্ভুত আত্মসম্মান বোধের জন্য তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কথিত আছে যে, কলেজের অধ্যক্ষ কবিকে অভ্যর্থনা করার জন্য ফটক পর্যন্ত আসেননি বলেই কবি এই পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হয়েছিলেন।

কলকাতা থেকে ফিরে আসা অবধি দীর্ঘ দিন ধরে কবির একটানা অভাব চলছিল। ঋণ করে সংসার চালাতে হত। বহুদিন পরে এক সঙ্গে কিছু টাকা পেলে তার সবটাই পাওনাদার ও মহাজনদের দিয়ে দিতে হত। কিন্তু এসব করা সত্ত্বেও ১৮৩৫ সালে তিনি এত বেশী ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, মহাজনরা এক সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে চার-চারটি মামলা আদালতে দায়ের করে দেয়। ঘর থেকে বের হওয়াই তাঁর জন্য মুশকিল হয়ে পড়ে। দীর্ঘ চার মাস পর্যন্ত কবি প্রায় নিজের ঘরে বন্দী হয়েই থাকেন।

একদা মহাজনরা কবিকে আদালত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। কবি তাঁর ঋণের কথা স্বীকার করে কাজীর সামনে নিম্নলিখিত

দুই পংক্তি কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

ঋণ করে করে নেশা করি আমি
জানতাম একদিন,
রঙীন সুরার রঙনে আমার
দুনিয়া রঙীন হবে।
(২৫ নং কবিতা)

এই আবৃত্তি শুনে কাজী মৃদু হাস্য করেন ও কবির বিরুদ্ধেই রায় দেন কিন্তু প্রতিভার সম্মান রক্ষার্থে কাজী নিজের গাঁট থেকেই ঋণ পরিশোধ করে কবিকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

ভাগ্যের এই বিড়ম্বনার সময়েই কবির দিন কোন রকমে চলে যাচ্ছিল কিন্তু ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিপক্ষের শত্রুতার দরুণ এমন এক দুর্ভাগ্যের ঝড় তাঁর মাথার উপর নেমে আসে, যার তুলনা তাঁর মতো নিয়তি-তাড়িত মানুষের জীবনেও সচরাচর খুঁজে পাওয়া যায়। এই দুর্ঘটনা তাঁর আবাল্যসঞ্চিত আভিজাত্যবোধ ও আত্মসম্মানের উপর এক অতি কঠোর ও করুণ আঘাতরূপে দেখা দেয়। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২রা জুলাই জুয়াখেলার দায়ে কবি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

চরিতকারদের সাক্ষ্য থেকে এই দুর্ভাগ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ যা জানা যায়, তা নিম্নরূপ ঃ

মনের ভার লাঘব করার জন্য কবি এই সময় তাঁর প্রিয় সতরঞ্জ খেলায় (দাবা) দীর্ঘ এক সময় অতিবাহিত করতেন ও খেলাকে অধিতর প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য তার উপর বাজিও রাখতেন। তৎকালে শহর থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্য যে কোন জুয়ার উপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। এই সতরঞ্জ খেলাকে উপলক্ষ করেই কবির গৃহকে জুয়াখেলার আড্ডা বলে চিহ্নিত করা হয় ও কবিকে জুয়ার দায়ে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়।

যে পরোক্ষ কারণ এই প্রত্যক্ষ অভিযোগের পেছনে কাজ করেছিল সেটি কবির বিরুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্র। তাঁর এক প্রভাবশালী বিরুদ্ধবাদী দলের অস্তিত্ব ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ছিল। এরাই কবির গৃহের সতরঞ্জ খেলাকে জুয়াখেলা বলে কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেছিল।

ফিরোজপুর ঝির্কার নওয়াব শামসুদ্দীন খানের ফাসীর ব্যাপারে গালিব জড়িত ছিলেন সন্দেহে এই শত্রুদল দীর্ঘ দিন যাবৎ তাঁর অনিষ্ট চিন্তায় রত ছিল। নওয়াব শামসুদ্দীন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের সঙ্গে সম্পত্তিবিষয়ক মোকদ্দমায় জড়িত থাকা কালে গালিব তাদের পক্ষ সমর্থন করে দিল্লীর তৎকালীন রেসিডেন্ট ফ্রেজার সাহেবের কাছে সুপারিশ করেছিলেন। উক্ত নওয়াব কবির প্রাপ্য সম্পত্তির অংশও দাবিয়ে রেখেছিল।

ফ্রেজার সাহেবের বিচারের ফল স্বরূপ নওয়াব শামসুদ্দীনকে ভাইদের প্রাপ্য অংশ দিতে হয়েছিল। কিন্তু সাহেবের এই বিচার নওয়াবের মনঃপুত হয়নি। তিনি ফ্রেজারকে হত্যা করে এর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। এই হত্যারই শাস্তি স্বরূপ তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছিল। এই হল পরোক্ষ কারণ।

কবির কারাদণ্ড মওকুফের জন্য দিল্লীর গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আদালতের কাছে সুপারিশ করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু আদালত তা অগ্রাহ্য করেছিল। পঞ্চাশ টাকা জরিমানা আদায়ে শুধু কায়িক পরিশ্রম থেকে তাঁকে রেহাই দেয়া হয়েছিল।

জানা যায় যে, যিনি এই করুণ শাস্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হিশেবে অতি অল্পদিন পূর্বেই দিল্লীতে এসেছিলেন। কবির আভিজাত্য, সুনাম ও সামাজিক প্রতিপত্তি সম্পর্কে কিছুই তাঁর জানা ছিল না। তদুপরি তৎকালীন পুলিশ ইনস্‌পেকটর কবির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল।

অবশ্য ছয়মাস কারাদণ্ডের সবটাই কবিকে ভোগ করতে হয়নি। তিন মাস পরে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল।

এই কারাবাস যে কবির জন্য কি মর্মান্তিক মনোবেদনার কারণ হয়েছিল, তাঁর লেখা চিঠি থেকেই তা জানতে পারা যায়। তিনি লিখেন ঃ

"যদিও আমি বিশ্বাস করি যে, যা কিছু ঘটে তা আল্লাহর তরফ থেকেই আসে; আর আল্লাহর সঙ্গে লড়াই করা যায় না ; এবং যদিও আমি মেনে নিয়েছি যে, যা ঘটছে তার কলঙ্ক থেকে আমি মুক্ত, আর যা কিছু পরে ঘটবে, তাও আমি অম্লান বদনেই মাথা পেতে

নিতে রাজি আছি, তথাপি আকাঙ্ক্ষা সমর্পণের (এবাদতের') বিরোধী নয়। আমার একান্ত প্রার্থনা, দুনিয়ায় যেন আর বেঁচে থাকতে না হয়। অগত্যা বাঁচতেই যদি হয় তবে হিন্দুস্তানে আর নয়।······ দেখা যাক কি হয় ?"

অন্য এক চিঠিতে লিখেন ঃ

"এ অবস্থায় শুধু ভাগ্যের খেলা দেখে যাওয়াই আমার কাজ— আর কিছুই নয়।··· ইংরাজ সরকারের চোখে আমার প্রভূত সম্মান ছিল। অভিজাত সন্তান বলেও আমি গণ্য হতাম। পূর্ণ 'খেলাত'ও (রাজপ্রদত্ত বসন) আমি পেয়েছি। কিন্তু এতদিনে বদনাম হয়ে গেল। একটা বড় রকমের কলঙ্কের দাগ আমাতে চিরদিনের জন্য জেগে গেল।"

বাল্যাবধি কবির বাসনা ছিল, তিনি জায়গীরদার হবেন। সমাজে তাঁর জন্য থাকবে সম্মানের আসন। এই দুর্ঘটনা তাঁর সেই স্বপ্নরাজ্য ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেল। এখন থেকে সমাজ তাঁর কাছে অসহ্য বোধ হতে লাগল। এই সময়ই তিনি লিখেছিলেন ঃ

এমন জায়গা খুঁজে নাও তুমি
যেখানে কেহই নেই,
সমব্যথী আর সমভাষী কিবা
বন্ধু স্বজন নেই।
(৩৩ নং কবিতা)

পত্রে প্রকাশিত হিন্দুস্তান ত্যাগ করে যাওয়ার সঙ্কল্প কবির পূর্ণ হয়নি। কবিতায় ব্যক্ত সামাজিক স্বেচ্ছানির্বাসনের ইচ্ছাও অপূর্ণই রয়ে গেল। সেইমত ধনবান হওয়ার স্বপ্ন, আভিজাত্য বজায় রাখার সঙ্কল্প চিরদিনের জন্যই ভেঙে খান খান হয়ে গেল। এই সময়ই নাসীরুদ্দীন শাহ নামে সম্রাট বাহাদুরশার আধ্যাত্মিক গুরুর মধ্যস্থতায় গালিব রাজদরবারে পরিচিত হন এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাজকার্যে গৃহীত হন।

এত দীর্ঘকাল দিল্লীতে বাস করেও গালিবের মতো মহৎ কবি কেন রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন, এ প্রশ্ন

পেরেছিলেন। এই সময় থেকে রামপুরের নওয়াব কবির জন্য এক শো টাকা মাসিক বৃত্তি ধার্য করে দিয়েছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরাজের কোপানল যখন স্তিমিত হল ও দেশে শান্তি ফিরে এল, তখন স্যার সৈয়দ প্রমুখের নেতৃত্বে নির্যাতিত মুসলমান তার ভাগ্য সংস্কারের কাজে মনোযোগী হল। সৈয়দের সংস্কার প্রচেষ্টা ও গালিবের করুণ কান্নাই তখন মুসলমানকে তার ভাগ্য সম্পর্কে সচেতন করেছিল। এই সময়েই আলতাফ হোসেন হালী হয়েছিলেন গালিবের মন্ত্র-শিষ্য। গালিব হিন্দুস্তানের উজাড় কানন জাগিয়ে তোলার ভার হালীর হাতেই দিয়ে গেলেন।

উর্দু সাহিত্যের এই রেনেসাঁসের সঙ্গে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। তবে তাদের গতি হয়েছিল দুই ভিন্ন পথে। এই প্রবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আরো বলা হবে।

প্লেটো যেমন সক্রেটিসের মৃত্যু ও শেষ দিনগুলোর কথা করুণ ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন, হালীও তেমনি গালিবের শেষ দিন-গুলোর বিষাদিত চিত্র আমাদের জন্য এঁকে রেখে গেছেন। হালী এবং কবির অন্যান্য চরিতকারের অনুবর্তিতায় আমরাও সেই চিত্রের খানিকটা এখানে উন্মোচিত করলাম। অভাব, দুশ্চিন্তা ও যৌবনের অমিতাচার শেষদিকে কবির সুন্দর সুঠাম দেহকে রোগ-ব্যাধির কবলিত করেছিল। ১৮৫৯ খৃস্টাব্দের পর থেকে যদিও তাঁর আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভাল হয়েছিল, কিন্তু স্বাস্থ্যের দীপ্তি আর ফিরে আসেনি। দিনে দিনে তাঁর দেহ এতটা অপটু হয়ে পড়েছিল যে, লিখতে গেলে হাত কাঁপত। কয়েক বছর ধরে দেহে ক্রমাগত বড় বড় ক্ষত দেখা দিতে লাগল। চিকিৎসকগণ এই ক্ষতকে কবির অমিত সুরাপানের বিষময় প্রতিক্রিয়া বলে নির্দেশ করেছিলেন। শেষের দিকে দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তিও তাঁকে আংশিকভাবে হারাতে হয়েছিল। এই সময় কবি জীবনের প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি মৃত্যু কামনা করতেন। তাঁকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত, "হে মৃত্যু, তোর আর বিলম্ব কিসের?" এই সময়ই

তিনি নিজের মৃত্যু-বর্ষ নির্দেশক এক ফারসী 'কিতা' রচনা করে-ছিলেন, যাতে মৃত্যু-বর্ষ লেখা হয়েছিল ১৮৬১ সাল। কিন্তু কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়নি। এর পরেও তাঁকে আট বছর বেঁচে থাকতে হয়েছিল। এই শেষের দিনগুলো কবির জন্য হয়েছিল আরো বেশী মর্মান্তিক। তিনি তখন প্রায়ই বলতেন, "আমার প্রতিটি শ্বাস মৃত্যু-শ্বাসের মতো কণ্টকর। মৃত্যুকেই মুক্তি বলে মনে করি, আর সেই মৃত্যুরই পথ চেয়ে আছি।"

এই সময় এক কবিতায় তিনি লিখেন ঃ
"গালিব, সমস্ত দুঃখের ভরাই তোর পূর্ণ হয়েছে,
এখন শুধু আকস্মিক মৃত্যুই সামনে আছে।"

হালী বলেন যে, মৃত্যুর কয়েকদিন আগে থেকেই কবি মাঝে মাঝে মূর্ছিত হয়ে পড়তেন আর এই মূর্ছা কয়েক ঘন্টা ধরে অব্যাহত থাকত। সংজ্ঞা ফিরে এলেই বলতেন, "শেষ নিশ্বাস নিকটবর্তী বন্ধুগণ, এখন শুধু আল্লাহ্ আল্লাহ্!" তারপর শেষ মুহূর্ত নিকটবর্তী হল ও অর্ধশতাব্দী ধরে যে গানের বুলবুল ভারতের উজাড় কানন জাগিয়েছিল, তার অনুপম কণ্ঠ চিরনীরব হল। সেই দিনটি ১৮৬৯ খৃীস্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

কবির শেষকৃত্য সুন্নীমতেই নিষ্পন্ন হয়েছিল। তাঁর নশ্বর দেহ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাযার মধ্যস্থ মুসলিম ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি আমীর খসরুর সমাধির নিকটেই সমাহিত করা হয়েছিল।

গালিব ছিলেন এক মহান যুগের ঐতিহ্যবাহী এক উন্নতশির মহাকবি। নীচতা ও ক্ষুদ্রতা তাঁর উন্নত চরিত্রকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। সত্যের প্রতি ছিল তাঁর অবিচল নিষ্ঠা। কপটতা ও মিথ্যাচারকে তিনি অন্তরের অন্তস্তল থেকে ঘৃণা করতেন। এজন্য সমসাময়িক অনেককেই তাঁর বিদ্রুপের কশাঘাত সহ্য করতে হয়েছে। গালিব ছিলেন অতিশয় নির্ভরযোগ্য ও সহানুভূতিশীল বন্ধু। এই বন্ধুবাৎসল্য ও নির্ভরশীলতার জন্যই তাঁর অগণিত বন্ধু-লাভ ঘটেছিল। অভিজাত ও যুদ্ধপ্রিয় তুর্কী পিতৃপিতামহের নীলরক্ত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত ছিল। তাই তাঁর মহত্ত্ব ও অকপটতা

সৈনিকের উলঙ্গ তরবারির মতোই সবল ঋজু ছিল। রুচি ও আত্ম-সম্মান বোধের এক জাগ্রত প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। তাঁর মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা ছিল তাঁর অন্তরাত্মার সব চাইতে বড় পরিচয়। অপরের পদাঙ্ক অনুসরণকে তিনি তুচ্ছতা ও দুর্বলতার প্রমাণ বলে মনে করতেন। মৌলিকতায় ছিল তাঁর সফল অধিকার।

চরিত্রের এই মহৎ গুনাবলীর পাশেই কতকগুলো মন্দ গুণও তাঁর ছিল। অতিমাত্রায় স্বাধীনতাপ্রিয়তা তাঁকে আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মম্ভরী করে তুলেছিল। তাঁর আত্মম্ভরিতার হাত থেকে অনেক সময় তাঁর স্বজনবর্গও রেহাই পেতেন না। তাঁর চরিত্রের অপর দোষ ছিল, অমিতাচার, মদ্যপান ও অমিতব্যয়িতা। তাঁর সারা জীবন-ব্যাপি অর্থাভাব ও দীর্ঘদিন রোগভোগের কারণও ছিল এই সব অসংযম। স্বামী হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অবিবেচক। বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি বিরূপতা তাঁর পারিবারিক জীবনকে অর্ধ-শতাব্দীরও বেশীকাল ধরে বিষময় করে রেখেছিল।

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, কবির চরিত্রের এই সব দোষ তাঁর নিজেরই ক্ষতি করেছে বেশী। অপরের প্রতি তিনি সর্বদাই সদয় ব্যবহার করতেন। তাঁর চরিত্রের আরেকটি প্রধান গুণ ছিল উদারতা। শত্রুর প্রতিও তিনি উদার হতে পারতেন এবং তাদের গুণকীর্তনে তাঁর কোথাও বাঁধত না। এই উদার দৃষ্টিভঙ্গীই গালিবের কবিতাকে সার্বজনীন রূপ দিয়েছিল। কবির বন্ধুদের মধ্যে হিন্দু, খ্রীষ্টান ও অগ্নিপূজক—সবাই ছিল।

কবির চরিত্রের আরেকটি গুণ ছিল তাঁর রসিকতা ও কৌতুক-প্রিয়তা। সকল দুঃখ-দুর্দশা ও হতাশা-যন্ত্রণার মধ্যেও এই রসিকতা ও কৌতুকপ্রিয়তা তাঁর থেকে অন্তর্হিত হয়নি। দুর্দিনের ঘনঘটায় এই কৌতুকপ্রিয়তাই তাঁর অন্তর-দিগন্তে রংধনুর বর্ণবৈচিত্র্য ছড়িয়ে দিত।

গদ্যে ও পদ্যে লেখা কবির কয়েকখানি বই সিপাহী বিদ্রোহের সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়। বহু চেষ্টায়ও সেগুলো আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এখন পর্যন্ত যে কয়টি গ্রন্থ তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে রয়ে গেছে, তাই তাঁকে উর্দু সাহিত্যের

শ্রেষ্ঠতম জ্যোতিষ্ক ও ফারসীর এক শক্তিশালী কবিরূপে চিহ্নিত করে দেয়া। এক আমীর খসরু ছাড়া মুসলিম-ভারত গালিবের মতো এমন বহুমুখী প্রতিভার আর জন্ম দিতে পারেনি।

গালিবের রচিত নিম্নলিখিত বইগুলো কালের ধ্বংস এড়িয়ে বেঁচে আছে।

কবিতা

১। দীওয়ানে গালিব (উর্দু)
২। কুল্লিয়াতে নয্‌মে ফারসী
৩। গুলে রা'না (ফারসী)
৪। ইনতিখাবে দীওয়ানে ফারসী

গদ্য রচনা

৫। কুল্লিয়াতে নস্‌রে ফারসী
৬। রোকআতে গালিব (ফারসী পত্রাবলী)
৭। উর্দুয়ে মুআল্লা
৮। মাকাতিবে গালিব (উর্দু পত্রাবলী)
৯। মেহ্‌রে নীমরোজ (ইতিহাস)

॥ দুই ॥

আগেই বলেছি যে, গালিব উর্দুর শ্রেষ্ঠ কবি ও মোগল চিত্তোৎকর্ষের শেষ রূপকার। এ উপলক্ষে উর্দু কাব্য-সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক আলোচনা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কারণ, শ্রেষ্ঠত্ব যেমন তুলনামূলক ব্যাপার, তেমনি মোগল চিত্তোৎকর্ষও ভুঁইফোঁড় নয়। বিশেষ করে গোটা উর্দু কাব্যই সেই চিত্তোৎকর্ষের অনেকখানিকে তার মধ্যে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছে।

উর্দু মূলতঃ ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃত ভাষারই দুহিতা। কিন্তু মুসলিম যুগে, বিশেষ করে মোগল যুগে এর সাহিত্যিক উৎকর্ষ ফারসীর কাছে এমনভাবে ঋণী হয়ে পড়ে যে, সেই ঋণকে অনেকটা ধাত্রীর বুকের দুধ কিংবা মায়ের মুখের বুলির মতো মনে করা যেতে পারে।

দিল্লী-আগ্রার মুখের ভাষা ব্রজবুলি কখন প্রথম সাহিত্যিক রূপ পেয়েছিল, সঠিক করে বলা যায় না। তবে আমীর খসরুর

লিখিত উর্দু ছড়া ও গীতগুলোকে যদি এর প্রথম সাহিত্যিক প্রকাশ বলে ধরে নেয়া হয়, তবে এর কাল চতুর্দশ শতকের সূচনা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। আমীর খসরুর কাল সুলতান আলাউদ্দীন খালজীর কাল। হিন্দী কাব্যের উন্মেষক্ষণ তখনো অনেক দূরে—জৈসী তখনো তাঁর 'পদুমাবৎ' কিংবা তুলসীদাস তাঁর 'রামায়ণ' লিখেননি।

মহাপ্রতিভা খসরু যেমন ভারতীয় রাগ-রাগিণীর ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে অতি অপূর্ব রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি নতুন ভারতীয় ভাষা উর্দুতেও চলছিল তাঁর গজল ও গীতিকা রচনা।

খসরুর সামনে ব্রজভাষার কোন সাহিত্য বর্তমান ছিল না। তাই তাঁকে ফারসীর ছাঁচেই ঢালাই করে নিতে হয়েছিল ব্রজভাষাকে অর্থাৎ উর্দুকে। খসরুর আত্মপ্রকাশের প্রধান ভাষাও ছিল ফারসী।

দিল্লীর এই মহাপ্রভাবশালী কবির অনুসরণই পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে দিল্লী-আগ্রার কবি-গোষ্ঠীর গর্বের ও প্রেরণার বস্তু ছিল। এই উজ্জ্বল শিখার রূপানল থেকে কোন কবি-পতঙ্গই যে আত্মরক্ষা করতে পারেননি, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। খসরুর পরে উর্দুতে যাঁরা কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেছেন, তাঁরা খসরুকেই কবিগুরু ও পথিকৃৎ রূপে দেখতে পেয়েছেন এবং যখনই মুসলমান কবিগণ দেশী ভাষায় কবিতা লিখবার জন্য কলম ধরেছেন, তখনই তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতে আকর্ষিত হয়েছেন আমীর খসরু ও ফারসীর দিকে। তাঁদের কল্পনার দিগন্ত ক্রমেই খুলে গেছে ইরানের শীরাজ ও ইস্পাহানের গোলাপ বনের দিকে।

আধুনিক কাল পর্যন্তও উর্দু কবিতায় যে 'দজলা-ফোরাত,' 'গুল ও বুলবুল,' 'জামশেদ আফ্রাসিয়াব,' 'শিরী-ফরহাদ,' 'রুস্তম-সোহরাব,' 'সাকী-শরাব' প্রভৃতি অসংখ্য কল্প-চিত্র দেখা যায়, তা ফারসীর প্রতিই তার দীর্ঘদিনের আনুগত্য ও ঋণের কথা প্রকাশ করে।

কিন্তু উর্দুর পক্ষে এ কথা সত্য হলেও পাক-ভারতের পূর্ব প্রান্তের বাংলা ভাষার মুসলমান কবিগণের পক্ষে একথা সর্বত্র সত্য নয়। কারণ, তাঁরা ফারসীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বাংলা কাব্যের মূল ধারার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেননি। একথা সত্য

যে তাঁদেরও দৃষ্টি দিল্লী-আগ্রার দিকে নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু তাঁরা শুধু সেখান থেকে ফারসী উপাখ্যান কাব্যের মানবীয় উপাদানগুলো সংগ্রহেই নিজেদেরকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। ফারসীর কাব্যরীতি গ্রহণ করেননি।

অপর পক্ষে উর্দু সাহিত্য প্রভাবশালী খসরুর অনুবর্তিতায় ফারসী কাব্যকেই তার পুরাপুরি আদর্শ ও আদলরূপে গ্রহণ করেছিল ও ফারসী গীতি কাব্যের ধারাটিকেই অনুসরণ করে চলেছিল। তাই বাংলা কাব্যে দৌলত কাজী কিংবা আলাওলের মধ্যে আমরা যেমন উপাখ্যান কাব্যের প্রাচীনতর ফারসী ধারার সাক্ষাৎ পাই, তেমনি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও গ্রাম-বাংলার উপাখ্যান ধারারও সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু ব্রজভাষার পরিণত রূপ উর্দুতে তেমন দেশী ঐতিহ্যের অঙ্গাবরণ লক্ষ্যযোগ্য নয়।

উর্দু কাব্যের আদি নিদর্শন হিসেবে আমীর খসরুর যেসব গজল পাওয়া যায়, তাদের বাহ্যিক-আভ্যন্তরীণ উভয় রূপেই ফারসীর প্রতিচ্ছায়া। খসরুর নব-নবোন্মেষ শালিনী প্রতিভা ব্রজভাষার কথা ও ভাবকে কি ভাবে যে ফারসীর কথা ও ছন্দের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছিল, তার নমুনা নীচে দেওয়া হল ঃ

শবা হিজ্‌রাঁ দরাজে চুঁ জুল্‌ফ ও রোজ ও ওস্‌লশ চুঁ উমর কোতাহ।
সখী পিয়াকো জো ময়্‌ না দেখুঁ তো কায়েস কাটোঁ আন্ধেরি রাতিয়াঁ।
চু শাময়ে সোজাঁ চু জররা হয়রাঁ যে মেহ্‌রে আঁ বগশতম্‌ আখির।
না নীন্দ নয়না না অঙ্গ চায়না না আপ আওয়েঁ না ভেজে পাতিয়াঁ।
বহক্কে রোযে বিসালে দিলবর কে দাদ মারা ফারেবে খুসরু।
সপেত মন্‌কে দরায়ে বাক্কোঁ জো জায়ে পাউঁ পিয়া কি খেতিয়াঁ।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, প্রত্যেকটি জোড়ার প্রথম পংক্তি ফারসী,

দ্বিতীয় পংক্তি উর্দু। উর্দু কাব্য-সাহিত্যে ফারসীর শব্দ ও ছন্দ বন্ধন প্রথম থেকেই কিভাবে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে রয়েছে, এই গজলটা তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এইভাবে চতুর্দশ শতকে ফারসীর কাব্য-রীতি, ছন্দ-রীতি ও রূপকল্প অঙ্গে ধারণ করে উর্দু কবিতার যাত্রা শুরু হয় ও তা ভারতে মুসলিম সভ্যতার প্রকাশস্থল হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের মুসলিম সভ্যতা মূলত ইরানী সভ্যতা—মোগল আমলে যা ভারতীয় প্রকৃতির মিশ্রণে এক বিশিষ্ট সংস্কৃতির জন্মদান করেছিল। উর্দু ভাষা ও সাহিত্য সেই জটিল সভ্যতাকেই প্রতিবিম্বিত করেছে।

ভারতে মুসলিম আমলের—বিশেষ করে মোগল আমলের সংস্কৃতির বড় পরিচয় হল তার নাগরিকতা। এখানকার গ্রাম-মুখীন সভ্যতার স্থানে নগর ভিত্তিক সংস্কৃতির পত্তন ভারতে মুসলিম সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান। উর্দু ভাষা ও সাহিত্য সেই অবদানকেই মানসিকতার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ফিউডাল যুগে সমাজ জীবনের যে ধারাটি নগর মুখী, উর্দু কাব্যে তারই রূপায়ণ। তাই চতুর্দশ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় সমাজের সবচাইতে প্রভাবশালী শ্রেণীর মুখপাত্র হিসেবেই উর্দু কাব্যকে কথা বলতে শোনা যায়। ফলে অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকেই ভারতের সেই প্রভাবশালী সমাজ অংশের মধ্যে যে অবক্ষয় (decadence) নেমে এসেছিল, উর্দু কাব্যে তারও যথারূপ প্রতিফলিত হয়েছে, দেখতে পাই।

এই সময়কার অন্যান্য ভারতীয় ভাষার বেলায় এই কথাটি বলা চলে না। বাংলা ভাষারই নজীর নেয়া যাক। এই ভাষা সারা মুসলিম আমল ধরেই গ্রাম মুখীন সমাজ জীবনের রূপকার রয়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে আলাওল ও ভারতচন্দ্রের মত রাজসভার কবি দেখা দিলেও বাংলা কাব্যের মূল ধারাটি গ্রাম নির্ভর অজটিল জীবন ও গ্রাম্য প্রকৃতির দিগন্ত বিস্তারী প্রসারের মধ্যে দিয়ে চলেছে, দেখতে পাই। সেখানে রাজসভার ঈর্ষা ও ঐশ্বর্য বিভ্রম নেই, নেই জটিল নাগরিক জীবনের ছলাকলা। সেখানে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাসের পদাবলীর মধ্যে প্রাকৃতজনের মর্মের গভীর বিরহ বোধ ও

হামারা ম্যার হাম মেঁ
হমন্ কো ইনতিজারী ক্যা ?
না পল্ বিছড়ে পিয়া হাম সে
না হাম বিছড়ে পিয়ারে সে,
ইন্‌হী সে নেহ লাগী হায়
হমন্ কোন বেকারারী ক্যা ?
কবীরা ইশক্ কা ম্যাতা
দুঈকো দূর কর্ দিল্ সে
জো চল্‌না হায় রাহ্ নাজুক হায়
হমন্ কো বুঝ ভারী ক্যা ?

কবীরের পর থেকেই উর্দু কবিতা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং মরমীয়া ভাব ও ধর্মীয় কথার বাহনরূপে সবত্র সমাদৃত হতে থাকে।

এই সময় বাহমনী রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় দাক্ষিণাত্যে উর্দুর প্রসার উত্তর ভারতকেও ছাড়িয়ে যায়। শাহ্ মীরানজী ও তাঁর পুত্র শাহ্ বুরহানুদ্দীন উর্দু কবিতার মাধ্যমেই দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে সুফী মতবাদ প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। জনসাধারণ ছিল তাদের লক্ষ্য, তাঁদের কবিতার পাঠকও ছিল জনসাধারণই। কাজেই দাক্ষিণাত্যের উর্দু অনেকটা ফারসীর প্রভাবমুক্ত হয়ে দেশীভাষার শব্দাবলী গ্রহণে তৎপর হয়েছিল। উত্তর ভারতের ফারসীর ইন্দ্রজাল বিন্ধ্যাচলের উত্তুঙ্গতাকে অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ দক্ষিণকে উদ্বেল করে তুলতে পারেনি।

কিন্তু দাক্ষিণাত্যের এই বিচ্ছিন্ন সাধনা বেশী দিন চালু থাকতে পারেনি। ষোড়শ শতকের শুরু থেকেই মোগল সংস্কৃতির জোয়ারে সারা উত্তর ভারত যখন হাবুডুবু খেতে লাগল, তখন দাক্ষিণাত্যও সেই প্রবল সংস্কৃতি-বন্যায় নিমজ্জিত হল। উর্দু কাব্যে উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের ধারা মিশে একাকার হয়ে গেল।

সপ্তদশ শতকের এক শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি পণ্ডিত চন্দ্রভান (ভনিতা বর্হমন্) সম্রাট শাজাহান অথবা যুবরাজ দারাশিকোর

মুনশী ছিলেন। তিনি ফারসীতেও কাব্য লিখে গেছেন। তাঁর উর্দূ কবিতা অতি অল্পই পাওয়া গেছে। নীচে তাঁর একটি উর্দূ গজলের নমুনা দেওয়া হল। উর্দূ কবিতা প্রথম থেকেই যে ফারসী গীতিকবিতার ধারাটিকে অনুসরণ করে চলছিল, চন্দ্রভানের গজলেও তারই প্রমাণ রয়েছে। কবি রাজকার্যে দূরবর্তী কোন শহরে গমন করেছেন। সেখানে রাজধানীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য নেই, সেখানে পরিচিত জীবনযাত্রার ব্যাঘাত ঘটেছে, কবি বলছেন ঃ

খুদা নে কিস্ শহর আন্দর্
হমন্ কো লায়ে ডালা হায়,
না দিল্‌বার হায় না সাকী হায়
না শীশা হায় না পেয়ালা হায়।
খুবাঁ কে বাগ মে রওনক হয়ে
তো কিস্‌তরহ য়ারাঁ,
না দূনা হায় না মার্ওয়া হায়
না সওমন্ হায় না লালা হায়।
পিয়া কে নাউঁ কি সমুরন
কিয়া চাহেঁ তো করে কিস্ মেঁ
না তসবী হায় না সমুরন হায়
না কন্ঠী হায় না মালা হায়।
পিয়াকে নাম আশেক কূঁ কতল্
য়া আজব দেখে হুঁ
না বর্‌ছী না কির্‌ছে হায়
না খঞ্জর হায় না ভালা হায়।
বরহ্‌মন ওয়াস্তে আশ্‌নান কে
ফিরতা হায় পগয়া মেঁ,
না গঙ্গা হায় না যমুনা হায়
না নদ্দী হায় না নালা হায়।

গজলটিতে গঙ্গা-যমুনা ও কন্ঠীমালার কথা থাকলেও কবির চিত্তভূমি যে নগর তা বুঝতে কষ্ট হয় না। সাকী, শীশা, পেয়ালা,

সওসন্. মালা যে ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, চন্দ্রভানের কবি-মনের অধিষ্ঠানভূমি সেই ফারসী কাব্যই।

চন্দ্রভানের অল্পকাল পরেই সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ওলী দিল্লীতে আগমন করেন। ওলীর আগমনে দিল্লীতে উর্দু কাব্যচর্চার এক সমৃদ্ধ যুগের প্রবর্তন হয়। ওলী তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি। তিনি বহুলভাবে ফারসী কাব্যের অনুসরণ করেন ও ফারসী কবিতার সকল রূপেই কাব্য রচনা করেন। গজল, কাসীদা থেকে শুরু করে মস্‌নবী, রুবাঈ, কিতা প্রভৃতি সকল ধরনের কবিতা রচনায়ই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ওলীর প্রবর্তনায়ই উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের কবিদের মধ্যে ফারসী ভাষার বদলে উর্দুতে কাব্যরচনা বৈদগ্ধের পরিচয় বলে স্বীকৃতি লাভ করে। ওলীর কাব্যেই উর্দু ভাষা তার শৈশব অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর কিছুকাল পর থেকেই মোগল কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে। দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ, উত্তর ভারতের লক্ষ্ণৌ ও বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদে স্বাধীন রাষ্ট্রীয় শক্তির পত্তন হয়। নাদির শাহ প্রমুখ বহিঃশত্রু ও জাঠ-মারহাট্টা প্রভৃতি দেশীয় শত্রুর আক্রমণের মুখে দিল্লীর শান্তি-সমৃদ্ধি ক্রমেই নষ্ট হতে থাকে। রাজদরবারে পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশায় অনেক কবিই তখন অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ লক্ষ্ণৌর পথ ধরেন।

বিখ্যাত কাসীদা লেখক সওদা বাদশাহ শাহ আলমের রাজত্বকালে দিল্লীতেই কাব্য রচনা শুরু করেন ও বিদগ্ধ সমাজে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু দিল্লীর অবস্থা তাঁর আর্থিক প্রতিপত্তি লাভের অনুকূল ছিল না বলে কবি জীবনের মধ্যাহ্ন কালেই দিল্লী থেকে লক্ষ্ণৌয়ে হিজরত করে আসেন ও বাকী জীবন নওয়াব শুজাউদ্দৌলার দরবারের কবি হিসেবে সেখানেই অতিবাহিত করেন। কাসীদা লেখক হিসেবে সওদা সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করলেও, গজল-রচয়িতারূপে তিনি কারো চাইতে খাটো ছিলেন না। তাঁর গজলগুলো উর্দু কাব্যের শ্রেষ্ঠ গজলের সারিতে

এসে দাঁড়াতে পারে। সওদার সমসাময়িক কবি ছিলেন ইনশাআল্লাহ খাঁ। তিনিও লক্ষ্ণৌ-দরবারেরই কবি ছিলেন। সওদা ও ইনশার পারস্পরিক কবিতা-যুদ্ধ দরবারীদের উপভোগের সামগ্রী ছিল। ইনশা ছিলেন ভাষার যাদুকর। প্রতিভায় তিনি সওদার সমকক্ষ না হলেও বাক্‌পটুতায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি উর্দু ভাষার বিস্ময় 'কাসীদায়ে বেনুকতা' অর্থাৎ নুক্‌তাশূন্য (অক্ষরের উপরে বা নীচে যে বিন্দু বসে তাকে নুকতা বলা হয়, যেমন 'র' অক্ষরের নীচের বিন্দু) শব্দ দ্বারা এক দীর্ঘ কাসীদা রচনা করেছিলেন। উর্দু কবিতার ছন্দ নিয়েও তিনি সাফল্যজনক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন।

সওদা, ইনশার কিছুকাল পরেই উর্দুর শ্রেষ্ঠ গজল লেখক মীর তকীও দিল্লী ছেড়ে লক্ষ্ণৌর পথ ধরেছিলেন ও নওয়াব আসফুদ্দৌলার দরবারে অত্যন্ত সাদরে গৃহীত হয়েছিলেন।

সওদা ও মীরের রচনায়ই উর্দু কাব্য পূর্ণযৌবনে পদার্পণ করে। তাঁরাই উর্দুকে ফারসী ও হিন্দীর দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক স্বাধীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ই উর্দু ভাষার শব্দসম্ভার যথেষ্ট বেড়ে যায় ও বাক্‌ভঙ্গীতে (idiom) স্বকীয়তার দীপ্তি ঝলকিত হয়। সমালোচকদের মতে সওদা ও মীরের যুগই উর্দু কাব্যের স্বর্ণযুগ।

মীরের সমসাময়িক অথবা কিছুকাল পরের কবি আগ্রার নযীর। সমালোচকগণ উর্দু কাব্যের মূল ধারার মধ্যে নযীরের স্থান নির্দেশ করতে পারেননি। এই অপারগতার কারণ নযীরের কাব্যপ্রয়াসের বিলক্ষণতা। যে নাগরিক ধারা আমীর খসরুর কাল থেকে উর্দু কাব্যে চলে আসছিল, নযীর তার থেকে দূরে সরে গিয়ে কাব্য রচনা শুরু করেন। তৎকালীন দিল্লী-লক্ষ্ণৌর সাহিত্যিক বৈদগ্ধের পরিচয় যে গজল, তিনি তা রচনা করেননি বললেই চলে। তিনি ভারতীয় অন্যান্য ভাষার গীতি-কবিতার মতো নাতিদীর্ঘ কবিতাই রচনা করে গেছেন। নযীরই বোধ হয় উর্দুর প্রথম 'নযম' রচয়িতা।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, নযীরের এই একক প্রয়াসের উৎস কোথায়? কেন তিনি উর্দুর নাগরিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন একান্তে সরে এসেছিলেন? কবিতার এ ঐতিহ্য তিনি কোথা থেকে আহরণ করেছিলেন?

নযীরের এই একক প্রয়াসের মূলে ছিল তাঁরই কবিপ্রকৃতি। সওদা ও মীরের পর থেকে উর্দু কবিতায় যে গতানুগতিকতা ও প্রাণহীনতা প্রসার লাভ করছিল, নযীর তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। এই প্রভাব থেকে তাঁর আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ছিল প্রকৃতির নির্জন ও প্রাণময় পরিবেশে প্রয়াণ করা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন তাঁর ঐতিহ্যের মূল সম্পর্কে। আমাদের মনে হয়, নযীরের ঐতিহ্য উর্দু কাব্য প্রয়াসের বহির্ভূত নয়। তিনি বাংলা, প্রাকৃত কিংবা সংস্কৃত প্রভৃতি কোন অপরিচিত উৎস থেকে তা আহরণ করেননি। সাধক কবীর উর্দু কবিতায় যে জনতামুখী ঐতিহ্যের প্রবর্তন করেছিলেন, নযীর তারই অনুসারী। তিনি স্বীয় অন্তরপ্রকৃতির তাড়নায়ই প্রচলিত মসনবীকে গীতিকবিতার নাতিদীর্ঘ পরিসরের মধ্যে টেনে এনেছিলেন। নযীর সূফী ভাবাপন্ন কবি ছিলেন। তাঁর কবিতায় মানবহৃদয়ের অজটিল ও গভীর অনুভূতিগুলোকে প্রকৃতির সঙ্গে লগ্ন দেখতে পাই। পাখী, ফুল, বর্ষার মেঘ, নদীর ধারা তাঁর কবিতায় প্রাকৃত জনের পরিবেশটাকেই মূর্ত করে তোলে। তাই উর্দুর সমালোচকগণ নাগরিক পরিবেশমুক্ত নযীরের কবিতাকে উঁচুদরের কবিকীর্তি বলে গণ্য করতে পারেননি।

নযীরের পর উর্দুর নামকরা কবিদের মধ্যে ছিলেন নাসিখ, আতিশ, নাসীম ও যওক। নাসিখ, আতিশ ও নাসীম ছিলেন লক্ষ্মৌ দরবারের কবি। নাসিখ পরে লক্ষ্মৌর নওয়াব গাযিউদ্দিন হায়দরের বিরক্তি উৎপাদন করায় কিছুদিনের জন্য এলাহাবাদে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করেছিলেন। নাসীম কবি ছাড়াও উর্দু ভাষার এক খ্যাতনামা বৈয়াকরণ ও ভাষাবিদ্ ছিলেন। তিনিই উর্দু কাব্যে লক্ষ্মৌ রীতির প্রবর্তন করেছিলেন।

আতশ নাসিখেরই সমসাময়িক ও দরবারী কবি। কিন্তু দরবারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল বৈরাগ্যপূর্ণ। দরবার থেকে তিনি যে মাসিক আশি টাকা বৃত্তি পেতেন, তার অধিকাংশই গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

দয়াশঙ্কর নাসীম এই সময়কার লক্ষ্ণৌর আরেকজন খ্যাতিমান কবি। তিনি আতিশের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁর কবি প্রকৃতির মধ্যে নাসিখের রঙও বেশ উজ্জ্বলভাবেই মিশেছিল।

যওক ছিলেন দিল্লী দরবারের প্রধান কবি। লক্ষ্ণৌর কবি গোষ্ঠী নিজেদেরকে দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করলেও দিল্লীর কবিগণ দিল্লী রীতি বলে ভাষার কোন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতেন না। তাঁদের গর্ব ছিল, দিল্লীই উর্দূ ভাষার কেন্দ্র—তাঁদের বৈশিষ্ট্য শুধু দিল্লীর নয়, সারা হিন্দুস্তানেরই বৈশিষ্ট্য।

গালিবের অব্যবহিত পূর্বের এই কবিগণের কাব্য প্রচেষ্টায় সমাজ জীবনের অবক্ষয়ের ছায়া পড়েছিল। এঁদের মধ্যে কারো কবিতায় মীর কিংবা সওদার শক্তি পরিলক্ষিত হয় না। এই সময়কার কাব্য শুধু কথার তুবড়িবাজিতে পরিণত হয়েছিল। নাসিখ ভাষার যে সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেই সংস্কার কেবল বাক্‌রীতির সুসঙ্গত ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কবিগণ দরবারী শ্রোতাদের বাহবার উপলক্ষ্য করেই তাঁদের কবিতা পরিবেশন করতেন। যদিও যওক ও নাসীমের কাসীদায় কোথাও কোথাও সূক্ষ্ম কারুকর্ম ও উন্নত কবি কল্পনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তবু সেই সব কাসীদা তোষণ ও বাগাড়ম্বরেই পর্যবসিত।

উর্দূ কাব্যের এই পটভূমিকায়ই গালিবের আবির্ভাব। যে বৈশিষ্ট্যের জন্যে গালিব উর্দূ কাব্যকে জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, সেই বৈশিষ্ট্য তাঁর উন্নত কবি কল্পনা, গভীর অনুভূতি এবং ভাষার সঙ্গীতময়-ইঙ্গিতময় চরিত্রের আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে। অতঃপর আমরা গালিবের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক সেই কবিকর্মের আলোচনায়ই আত্মনিয়োগ করতে যাচ্ছি। এই আলোচনার পটভূমি

হিশেবেই প্রয়োজন ছিল উর্দু কাব্যের বিগত ছয় শো বছরের এক সংক্ষিপ্ত অনুষঙ্গ ও তার কবিদের কাল-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক একটুখানি পরিচয়।

॥ তিন ॥

কাব্য কবি-চিত্তগহনের নিগূঢ় প্রেরণার বহির্প্রকাশ—শুধু গীতি-কাব্য নয়, সকল প্রকার কবিকর্মের পরিচয়ই মূলতঃ এই। কিন্তু গীতি কবিতার সঙ্গে এই কবি-চিত্তগহনের সম্পর্ক সরাসরি। তাই গীতি কবিতায় কবির ব্যক্তিত্ব ও মানসগঠনের ছাপ অধিকতর স্পষ্ট।

গালিবের কাব্যালোচনায় কবির এই ব্যক্তিত্ব ও মানসগঠনের ছাপটিকেই আমরা বার বার দেখতে পাই। তাঁর কবিতায় তাঁর ব্যক্তিত্বের আকুতিই সাহিত্যিক সার্থকতা খুঁজে ফিরেছে। তাঁর অব্যবহিত পূর্বের কবিদের মতো গালিবের কবিতা দরবারী শ্রোতাদের বাহবার উপলক্ষ্য হিসেবে রচিত হয়নি। সারা হিন্দুস্তানের সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে একজন অনুভূতিপ্রবণ ও সচেতন জীবন প্রয়াসী মানুষের সার্থকতা লাভের গভীর ও ব্যক্তিগত আকুলতাই তাতে প্রকাশ পেয়েছে। এই আকুলতা, এই আকাঙ্ক্ষা না থাকলে যে কবি-তাই হয় না গালিব নিজেই সে মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন :

"কবিকর্ম শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও হাতপায়ের কাজ নয়; মনন চাই, আকাঙ্ক্ষা চাই।"

এই আকাঙ্ক্ষা কি? কেন কবির-চিত্তগহনে এই আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়? দৈনন্দিন জীবনে আমাদের যে অভাব তারই সম্পূরণ কি কবি-চিত্তগহনের সেই আকাঙ্ক্ষা? যদি তাই হয় তবে খাদ্য ও বসন-ভূষণের চাহিদাই কি কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপকরণ?

এসব কথার উত্তর দিতে হলে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক কি, আমাদের প্রথমেই তার খোঁজ নিতে হবে।

এরিস্টটল্ বলেছেন, বিশ্বের অনুকৃতিই কাব্যের উদ্দেশ্য, তিনি যখন একথা বলেন, তখন তাঁর সামনে ছিল হোমারের মহাকাব্য ও সফক্লেস প্রভৃতি নাট্যকারগণের নাটক। কিন্তু হোমারে তো নয়ই,

সফক্লেস প্রভৃতির মধ্যেও বিশ্বের নিছক প্রতিলিপিই অঙ্কিত ছিল না।

অন্যপক্ষে শেলী কাব্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতে কাব্যকে প্রকৃতপক্ষে এক স্বর্গীয় ব্যাপার বলে নির্দেশ করা হয়েছে। অথচ তাঁর কালেই তাঁর গুরু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও বন্ধু কীট্‌স্‌ বিশ্বপ্রকৃতির রূপ-রেখা-গন্ধ-স্পর্শের অনন্যসাধারণ রূপপ্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন।

প্রতীচ্যের এই দুই মহান সমালোচক কি তাহলে কাব্যকে সম্পূর্ণ বিপরীত দুই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন এবং কাব্যের সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশে ব্যর্থ হয়েছেন ?

আমাদের তা মনে হয় না। এরিস্টটল্‌স্‌ ও শেলী দু'জনই কাব্যকে কবিমানসের দিক থেকে বিচার করেছেন। এরিস্টটল্‌স্‌ দেখেছেন, জীবনের অধিষ্ঠানভূমি যে বিশ্ব কবিমন তা থেকেই প্রেরণা লাভ করে। আর শেলী দেখেছেন, কবিমন বিশ্ব থেকে যে উপাদান সংগ্রহ করে, তা কবি-চিত্তগহনের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে এক অপার্থিব সত্তায় রূপান্তরিত হয়। তাই কাব্যের বিশ্ব অনুকৃতি ও বিশ্বের স্বর্গীয় সত্তায় রূপান্তর দুইই সত্য ও অভিন্ন।

এ সম্পর্কে গালিবের মতামতও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "কবিত্ব হল অর্থের আবিষ্কার।"

কিসের অর্থ ?

জীবন ও বহির্বিশ্বের যে ছবি আমাদের চেতনায় প্রতিফলিত হয়, তারই অর্থের আবিষ্কার কবিত্ব। দৈনন্দিন জীবনও পরিপার্শ্বের যথাযথ চিত্রণ নয়, কবি-মানসে অর্থরূপে রূপান্তরিত জীবন ও বিশ্বই কবিতার বিষয়বস্তু।

তাই জীবন-নিরপেক্ষ বাগাড়ম্বর ও অপ্রাকৃত কল্পনা যেমন কবিতা নয়, তেমনি দৈনন্দিন জীবনের অসন-বসনের নিছক আকাঙ্খার চিত্রণও কবিতা হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

বিশ্বকে 'অর্থ' হয়ে কবিতায় আসতে হবে এবং সেই অর্থ তৈরি হবে কবিচিত্তগহনে। তাই কবির ব্যক্তিমানস কাব্য বোঝার পক্ষে এত প্রয়োজনীয়—তাই কবির জীবনী ও চরিতকথা এত মূল্য বহন করে।

আমরা একটু আগেই বলেছি যে, গালিব তাঁর সমসাময়িক

কবিদের জীবন-নিরপেক্ষ বাগাড়ম্বর ও তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছিলেন ও তার জন্য দৃষ্টিপাত করেছিলেন নিজেরই কবিসত্তার নিগূঢ় গহনের পানে। এই কবিসত্তা যে উনিশ শতকের ক্ষীয়মাণ সমাজের মধ্যে সার্থকতার সন্ধানী ছিল, তাও বলেছি।

বলা বাহুল্য, জীবনের গহন পানে যে কবির দৃষ্টি, তাঁর কবিতা জলের মতো সহজ হওয়ার কথা নয়। সমস্যাপীড়িত মানবসত্তা এমনিতেই জটিল, তদুপরি তার বিচিত্র আশা-আকাঙ্খা, আনন্দ-বেদনা কোন পূর্বকৃত ছকে বাঁধা নয়। গালিবের কবিতা পাঠে জীবনের এই জটিলতা ও ছক নিরপেক্ষতা মনে রাখা দরকার।

গালিব কবিতা লিখতে শুরু করেন বাল্যকাল থেকেই। এ বিষয়ে তাঁর পথপ্রদর্শক বা দীক্ষাগুরু কেউ ছিল না। আগ্রায় প্রথম থেকেই চলাফেরা ও পথ-বিপথ নির্বাচনের যে স্বাধীনতা তাঁর ছিল, সেটিকেই কবির সারা জীবনের ভূমিকা বলা যেতে পারে। এই স্বাধীনতা তাঁর তরুণ বয়সেই জীবনের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। যে মৌলিকতা গালিবের কবিতার প্রায় সবখানি, তারও সূচনা এই স্বাধীনতা থেকেই।

তৎকালীন উর্দুর শ্রেষ্ঠ কবি মীর তকী আগ্রায় গালিবের বাল্য রচনা দেখে বলেছিলেন, "এই বালকের যদি কোন দক্ষ ওস্তাদ মিলে যায় এবং তিনি তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন, তবে কালে সে অতুলনীয় কবি হবে; আর তা না হলে সে অবোধ্য প্রলাপ বকতে শুরু করবে।"

মীর তকীর এই ভবিষ্যদ্বাণীতে গালিবের কবিপ্রকৃতির সঠিক পরিচয় বিধৃত হয়েছে। মীর তকী উর্দুর এক শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক জীবনের জটিলতার যে বাণী গালিব তাঁর কাব্যে দিতে যাচ্ছেন, তার সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় ছিল না। জটিল আধুনিক জীবনকে কাব্যে ধারার চেষ্টা গালিবের পূর্বে উর্দু কবিতায় অজ্ঞাত ছিল। গালিব তাঁর এই জটিল নির্মিতি ও সূক্ষ্ম অর্থময়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। দীওয়ানের কবিতায়ই তিনি তাঁর কাব্য সম্পর্কে বলেছেন:

ওগো সচেতন, শ্রবণের জাল যতদূর চাও, ছড়িয়ে দাও,
কবিতা আমার অলক্ষ্য পাখী, অসীম সুদূরে উড়ছে আজ।

গালিবের কবিতায় এই আপাত দুর্বোধ্যতা যে তাঁর বাল্য রচনারই লক্ষণ ছিল তা নয়। দিল্লীতে কবি যখন রাজদরবারে গৃহীত হয়েছেন, তখনও অনেকেই তাঁর কবিতার দুর্বোধ্যতা নিয়ে অভিযোগ করেছেন। কিন্তু কবি সেই সব অভিযোগে অটল থেকে ঘোষণা করেছেন ঃ

প্রশংসা আর প্রতিদান আমি
চাই না বন্ধু কারো,
কবিতা আমার অবোধ্য বলে
না লাগুক কারো ভালো।
(৪২ নং কবিতা)

অবোধ্যতার এই অভিযোগ পাঠক সাধারণের অলস মনেরই পরিচয় দেয়। উর্দু কবিতার পাঠক সওদার কাসীদা পড়েছেন, মীরের গজলের রস আস্বাদন করেছেন। আবেগ ও ইমোশনের যে সহজ সরল রূপদান তাঁদের কবিতায় রয়েছে, তাতে মস্তিষ্ক চালনার অবসর কম। সেসব গজলকাসীদা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়তন্ত্রীর বাঁধা স্বরগ্রামে এসে আপনিই প্রহৃত হয় ও তাতে আনন্দ বেদনার ঝঙ্কার তোলে। কিন্তু গালিবের কবিতায় শ্রোতাকে মন-মানসের সকল প্রস্তুতি নিয়েই উন্মুখ থাকতে হবে। উনিশ শতকের উর্দু কাব্যের পাঠক তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারা গালিবের কবিতায় সঙ্গীতের সঙ্গে মানস চক্ষের উপর তার বক্তব্যের যে ছবিটা পড়ে, তাকে স্পষ্ট করে নিতে যে পরিশ্রমের দরকার তা করতে নারাজ ছিল। অথচ গালিবের কবিতার বিশেষত্বই ছিল, বাণীর ধীর অর্থ উন্মোচন রীতি। কিন্তু একবার যদি পাঠক এই বিলম্বিত অর্থমোচনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠত, তবে তার রসবোধের মে'রাজ ঘটে যেত। কাব্যের এই বিলম্বিত রসাস্বাদের কথাটাই কবি কি সুন্দর করে বলেছেন ঃ

তীর কি হৃদয় ক্ষতের বেদনা
কোন দিন বুঝবে প্রভু !
সেতো হৃদয় বিদীর্ণ করেই উড়ে পালায়।
(২নং কবিতা)

কিংবা ঃ

বাসনাভরা মন আমার দুঃখের আকর হয়েছিল,
কিন্তু হায়, বন্ধুরা উপর থেকেই শুধু তার
সামান্য কিছু কুড়িয়ে নিল।
(২নং কবিতা)

অথবা ঃ

গোলাপের গন্ধ প্রাণের কান্না দীপের ধুম
যা কিছু তোমার আসর থেকে বেরুল
ব্যাকুল হয়ে বেরুল।
(২নং কবিতা)

এই ব্যাকুলতাই গালিবের কবিতার বৈশিষ্ট্য। কবির ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা সমাজের কারাগার-প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে নিয়ত যে হতাশা-বেদনার জন্ম দিচ্ছে, তারই যন্ত্রণা চীৎকার তাঁর কবিতায় কখনো বিদ্রোহ, কখনো চোখের জল হয়ে ফুটে উঠেছে ; কিন্তু এই অভিযোগ আর বিদ্রোহের ভিত্তি যে সমাজনিরপেক্ষ তথা জীবন নিরপেক্ষ নয়, তা 'দীওয়ানের' প্রথম গজলেই মানবনিয়তির অসহায়তার জন্য যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তাতে ধরা পড়ে। কবি বলেন ঃ

কার রচনার শিল্পরীতির শেকায়েত করে চিত্রদল,
প্রতিটি ছবির অঙ্গসজ্জা জানায় করুণ মিনতি তার ?

মানুষ তার দেহের সীমার মধ্যে কি অসহায় ! তার মন আকাশের গ্রহ-তারার উর্ধ্বে নিজের আসন নির্দেশ করে, কিন্তু দেহকে তার পরিবেশের সংকীর্ণ প্রাচীরেই মাথা কুটে মরতে হয়। কবি অভিযোগ করে বলেন, কোন্ শিল্পী এমন অসহায় করে এই চিত্রগুলোকে নির্মাণ করেছে ? এ অবস্থা যে অসহ্য—এমন নিয়তির

উপর মানুষ প্রশ্ন না করে থাকতে পারে না। তাকে বলতেই হয় ঃ

> অবিরাম কাটি, রাত করি ভোর, শীর নদীধারা কোথায় আজো ?
> অতন্দ্র এই বিজন একাকী, অসহ্য এই পাষাণ কালো।
>
> (১নং কবিতা)

কবির চোখে মানুষের এই নিয়তি নির্জনে পরিত্যক্ত এক ভাগ্যহত প্রেমিকের ছবি হয়ে ভেসে উঠল। তবে কি প্রেমই এই নিয়তির জন্য দায়ী ? প্রেমিক মানুষ কি শীর নদীর ধারাকে, সার্থকতার ধারাকে কোন দিনই পাষানমুক্ত করে এক অব্যাহত গতি দান করতে পারবে না ?

এই প্রশ্নের উত্তর কবি দেননি। হয়ত তাঁর কর্তব্য তা নয়। কবি তাঁর অন্তরাত্মার প্রচ্ছন্ন বোধটিকে ছবির মত করে প্রকটিত করেন অথবা মনের আকুলি-বিকুলিকে সঙ্গীতে-ইঙ্গিতে পাঠকের চেতনার গোচরীভূত করে তোলেন। তাঁর দায়িত্ব তার বেশী নয়।

প্রশ্ন থেকেই যাবে ঃ ব্যথা থাকবে, অভিযোগ থাকবে এ রক্তের ধারা কখনো থামবে না। কবি সেই চিত্রই আঁকেন, সেই কান্নাই তাঁর সঙ্গীত।

কবির কথা তাঁর নিজেরই কথা—তবু তা ব্যক্তিতে সংহত সমাজের কথা। সেই কথার স্রোত ব্যক্তির অন্তর্গুহা থেকে সমাজের দিকে স্বতঃই প্রবাহিত। কবি বলেন ঃ

> আমার জ্বালায় তুহিন বাদল মেঘেরা বৃষ্টি ঝরিয়ে দিল,
> অগ্নিগিরির উৎসার যত ঘূর্ণাবর্তে তলিয়ে গেল।
>
> (৫নং কবিতা)

প্রশ্ন হতে পারে, কবির এই ব্যক্তিগত সংবাদ দেয়ার প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন আছে। এই সংবাদ শুধু উনিশ শতকের গালিব নামক এক ব্যক্তিরই সংবাদ নয়—এ হল সমাজের জমাট বাঁধা রক্তের কাহিনী—এ হল চিরদিনের মানুষের কাহিনী। কারণ, কবি নামক এক সহৃদয় তার অন্তরাত্মার নিগূঢ় জ্বালাবোধকে তার অসংখ্য পাঠকের অন্তরে সংক্রামিত করে দিতে যাচ্ছেন। এই সংক্রমনের আকাঙ্খাই কবির কবিতা—এই-ই তাঁর চরম লক্ষ্য। এই জ্বালা দিয়ে

পাঠক কি করেন, কবির তাতে কোন মাথাব্যথা নেই। সমাজ সচেতন কবির কর্তব্যও তার বেশী নয়। নিজের মনকে অবারিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাতেই প্রাণের প্রবাহ মুক্তি পায়—ব্যক্তি সমাজ ধারায় অবগাহন করে ধন্য হয়।

তাই নিতান্ত ব্যক্তিগত কোন একটি রাতে কবির যে অনিদ্রা, যে দুঃসহ জাগরণ, তার সংবাদটিও মূল্যবান।

নিদ্রাহীন রাত অসহ। কতখানি অসহ তার চিত্র রয়েছে তারই বিপরীতে যে নির্ভাবনার সুখে নিজেকে রাত্রির সুখকর বিশ্রামের মধ্যে এলিয়ে দিতে পেরেছে তার মধ্যে। ব্যক্তি ও সমাজ দুই-ই এই বিপরীত চিত্রের সহায়তায় নিজের দুঃসহ অবস্থার পরিমাপ করতে পারে। কবি বলেন ঃ

এখানে অঘুম—সারারাত শুধু ব্যথায় ললাটে আগুন জ্বলে,
গভীর আরামে বালিশে সেখানে ফুটে আছে মুখ স্বপ্নদলে।
(৫নং কবিতা)

আবার দিনের বেলায় ঃ

দুনিয়া সেখানে কামনা-রঙীন ফানুস উড়ায় গগন তলে
হায়রে এখানে শুকায় গোলাপ, বাতাসে দারুণ আগুন জ্বলে।
(৫নং কবিতা)

এইসব ব্যক্তিগত জ্বালা-বোধের পটভূমি সমাজই। তাই এমন কথা প্রায় বিদ্রোহের নামান্তর—কাব্যিক বিদ্রোহ। কবির ইতিহাস ধৃত ব্যক্তিত্ব কি করে যে কাব্যে প্রতিফলিত হয়, তারও উদাহরণ এখানেই দেখতে পাই। এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত গালিবের ব্যক্তি জীবনের অভাব দুর্দশার পাশে অলস আমীরদের নির্ভাবনার দিন রাত্রির ছায়া কি এই পংক্তিগুলোতে প্রতিফলিত হয়নি? যে দেশ ও বৃহত্তর সমাজ জীবনের উপর কবির ব্যক্তি জীবন দাঁড়িয়ে আছে, তারও পরিচয় কি এখানে নেই?

সকল শ্রেষ্ঠ গীতিকবিদের মতোই গালিবের মধ্যেও সমাজ কবি-মনের আকাঙ্খা ও ব্যর্থতার মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে। কবি সেগুলোকে কবিতায় এমনভাবেই প্রতিফলিত করেন যে তার কালকে উত্তীর্ণ হয়ে সর্বযুগেরই এক অনুভূতিপ্রবণ মানুষের ব্যথা-বেদনা ও

আশা-আকাঙ্খা হয়ে জন্মলাভ করে। গীতি-কাব্যের এই অন্তরঙ্গ পরিচয় গালিবের দীওয়ানের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

যেমন ঃ

লোকে বলে আমি অগ্নিপূজক
আগুনের ধ্যান করি,
(আমার) অনলবর্ষী ফরিয়াদ ছোটে
নিশীথ আকাশ ভরি।
(১৯ নং কবিতা)

অথবা ঃ

আমার শোণিতে মিটে নাই কিগো
তোমার পিপাসা আজো ?
প্রতি গোলাপের কাঁটায় আমার
খুনধারা বয় আজো।
(২২ নং কবিতা)

কিংবা ঃ

যে আসর কভু ভেঙ্গে গেছে তারি
স্মরণের পাতা হতে,
মানস চক্ষে প্রতিমাগুলোরে
আবার জাগায়ে তুলি।
(২৩ নং কবিতা)

গীতি-কাব্যের এই 'আমি' প্রাচীন মহাকাব্যের কিংবা আধুনিক উপন্যাসের নায়কের অনুরূপ। তার ব্যক্তিগত ব্যথা-বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাই তার দেশ ও কালের কাহিনীর উপাদান। সেই 'আমি'র এক অঙ্গ যুগের মাটিকে আঁকড়ে ধরে আছে, আরেক অঙ্গ পাখা বিস্তার করে অনন্ত আকাশের দিকে উধাও।

এই 'আমি'র আকাঙ্ক্ষার বৈচিত্র্যের অবধি নেই, তার দুঃখেরও অন্ত নেই। সে সম্রাটের মধ্যে, সে দাসের মধ্যে, সে পর্বতের উপত্যকায়, সে সমুদ্রের তীরে, সে ইরানে, সে হিন্দুস্তানে, সে

পুরুষে, সে নারীতে—সর্বত্র। তার চোখে জগৎ ও জীবন আজো কুমারী, দৃষ্টিতে আদিম নর-নারী বিস্ময়।

সে বলে :

সাত সখী তারা দিনের আলোয়
আকাশে লুকিয়েছিল,
রাতের বেলায় কি জানি আলসে
বসন উতারি দিল।
(২৯ নং কবিতা)

আরো বলে :

হাকনা গোলাপ যূথী ও পলাশে
রঙের বিভেদরাশি,
সকল রঙেই বসন্ত তার
এঁকেছে মোহন হাসি।
(৩৪ নং কবিতা)

এই 'আমি' বড় একাকী :

হেমন্ত বসন্ত কিংবা হোক না সে যে-কোন মৌসুম,
এখানে কেবল আমি পিঞ্জর ও পাখার ক্রন্দন।
(৩৭ নং কবিতা)

দুনিয়া তার চোখে শিশুর খেলার মতো—হাজার হাজার বছর আগে যেমন, হাজার হাজার বছর পরেও তেমন :

শিশুর খেলা এ-দুনিয়া বন্ধু
আমার চোখের পরে,
দিনরাত এই সুন্দর খেলা
নন্দিত করে মোরে।
(৪৩ নং কবিতা)

কিন্তু এই ব্যক্তি-মনের কথাই সমাজ, দেশ ও দুনিয়ার মানুষের কথা হয়ে উঠেছে। তার প্রকাশের মাধ্যম যদিও গজল ও তার

উপকরণ যদিও ব্যক্তিজীবনের অনন্ত কামনা-বাসনা আর হতাশা-বেদনা তবু তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে সারাটা যুগ।

একটু আগে বলেছি যে, কবির নিঃসম্পর্কিত চির-উধাও 'আমি'র এক অঙ্গ দেশ-কালের মৃত্তিকার সঙ্গে যুক্ত। এই যুক্ত 'আমি'ই ইতিহাসের মানুষ। গালিবও ইতিহাসের মানুষ ছিলেন। ছিলেন বলেই নিজেকে ব্যক্ত করতে গিয়ে পূর্বসুরীদের বাঁধানো পথ ছেড়ে নিজের পথ তাঁকে তৈরী করে নিতে হয়েছিল। ভাষার প্রকাশ ক্ষমতায় যোগ করতে হয়েছিল আরো অনেক শক্তি। ইতিহাস ঘটনার একটানা প্রবাহ নয়—জীবনেরই নব নব বিস্ময়।

গালিব উর্দু কবিতায় এই বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। তাঁর তৈরী পথে চলতে গিয়ে পাঠক ভিন্ন এক জগতের ছবি দেখতে পায়। এই জগৎ জীবনের রক্তাক্ত রূপের জগৎ—এই জগতের বাসনায় খুন ও প্রেমের উন্মত্ততা—এই জগৎ শৃংখলিত মজনুর বিচরণভূমি নজদের মরুউপত্যকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পাঠক ব্যাকুল হয় অপ্রাপ্তকে পাওয়ার জন্য। কামনার রক্তে অবগাহন করে সে তার কাম্যবস্তুকে পেতে চায়। 'দীওয়ানে'র সর্বত্র এই জগতের কথা—তার চিত্র। পাঠকের মনে কাম্যবস্তুর জন্য বাঁধনহারা আকাঙ্ক্ষার এই উদ্দীপ্তিই উর্দু কাব্যের রেনেসাঁস। এই রেনেসাঁসের প্রবর্তক গালিব—গালিব ছাড়া আর কেউ নয়।

গালিবের কাছে এই রেনেসাঁর ছিল মানবীয় বোধের পুনর্জাগরণ। আমরা তার ইঙ্গিত ও উদাহরণ আগেই উপস্থিত করেছি। কিন্তু সদ্য রাজ্য হারাবার যে দুঃখ ও বিগত সাত শো বছরের গৌরবময় অতীতের যে স্মৃতি মুসলমানের মনে কাঁটার মতো বিঁধেছিল, তাই গালিব-প্রবর্তিত উর্দু কাব্যের রেনেসাঁসকে এক বিশিষ্ট খাতে বইয়ে দিয়েছিল। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের মতো তা পাশ্চাত্যের সকল কিছুকেই মুক্ত মনে গ্রহণ করতে পারেনি। মধুসূদন যেমন হিন্দুসংস্কৃতির অতীতের মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে পেরেছিলেন, হালী তা পারেননি। মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর যখন তাঁদের নিকট অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন, তখন তাঁদের মধ্যে কোন গর্ববোধের সঞ্চার হয়নি; বরং সেই নিকট অতীত থেকে যত

দূরে তাঁরা সরে আসতে পেরেছেন, সার্থকতার ছবিটা তাঁদের চোখে ততই বেশী স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু হালী ও ইকবালের বেলায় তা হয়নি; তাঁরা মুসলমানকে, মুসলিম সংস্কৃতিকে তাঁদের চিন্তা ও অনুভূতি থেকে নির্বাসন দিতে পারেননি। কিন্তু তাই বলে যে তাতে সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার ছোঁয়া লেগেছিল, এমন ভাববার কারণ নেই। তেমন হলে তাঁদের প্রচেষ্টাকে কোন অর্থেই রেনেসাঁস বলা চলত না। কারণ, রেনেসাঁসের এক বড় পরিচয় হল মানবিকতা। আর মানবিকতার চর্চায় উদারতাই প্রথম ও শেষ কথা। মানবিকতাই যে হালী ও ইকবালের প্রধান বাণী ছিল, তার প্রমাণ তাঁদের ইসলাম-ব্যাখ্যা ও ইসলামের সেই সব ঐতিহ্যের অনুসরণের তাগিদের মধ্যে রয়েছে—যা মানবতার পরিপোষক।

কিন্তু চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে সেই মানবতা প্রশ্রয় পেলেও অনুভূতির ক্ষেত্রে তার প্রবেশ লাভ খুব সহজ ও সাবলীল হতে পারেনি। তাই ইকবালের কবিতা হয়েছে দর্শন লক্ষণাক্রান্ত ও হালীর কবিতা revivalism-এ পরিণত হয়েছে।

গালিব ও ইকবালের মধ্যে তফাৎও মূলতঃ এইখানে। ইকবাল গালিব-প্রবর্তিত উর্দু কাব্যের রেনেসাঁসে চিন্তার যে নেতৃত্ব দিয়েছেন, গালিবের মধ্যে তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি দুঃখ পেয়ে ও তা প্রকাশ করে সান্ত্বনা লাভ করতে চেয়েছেন এবং ভালবাসার মধ্যেই ব্যক্তি মানসের ক্রমদিগন্তবিস্তার তাঁর চিরকালের লক্ষ্য হয়ে রয়েছে।

আমাদের এই উক্তির সমর্থনে ইকবাল ও গালিব থেকে অনেক উদাহরণই উদ্ধৃত করা যেতে পারে, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। কারণ, উভয়ের গোটা কাব্য-প্রয়াসের মূলেই রয়েছে কবি-প্রকৃতির এই বিভিন্নতা। উভয়ের কাব্যের যে কোন অংশ এর পরিপোষক বলে দেখতে পাওয়া যাবে।
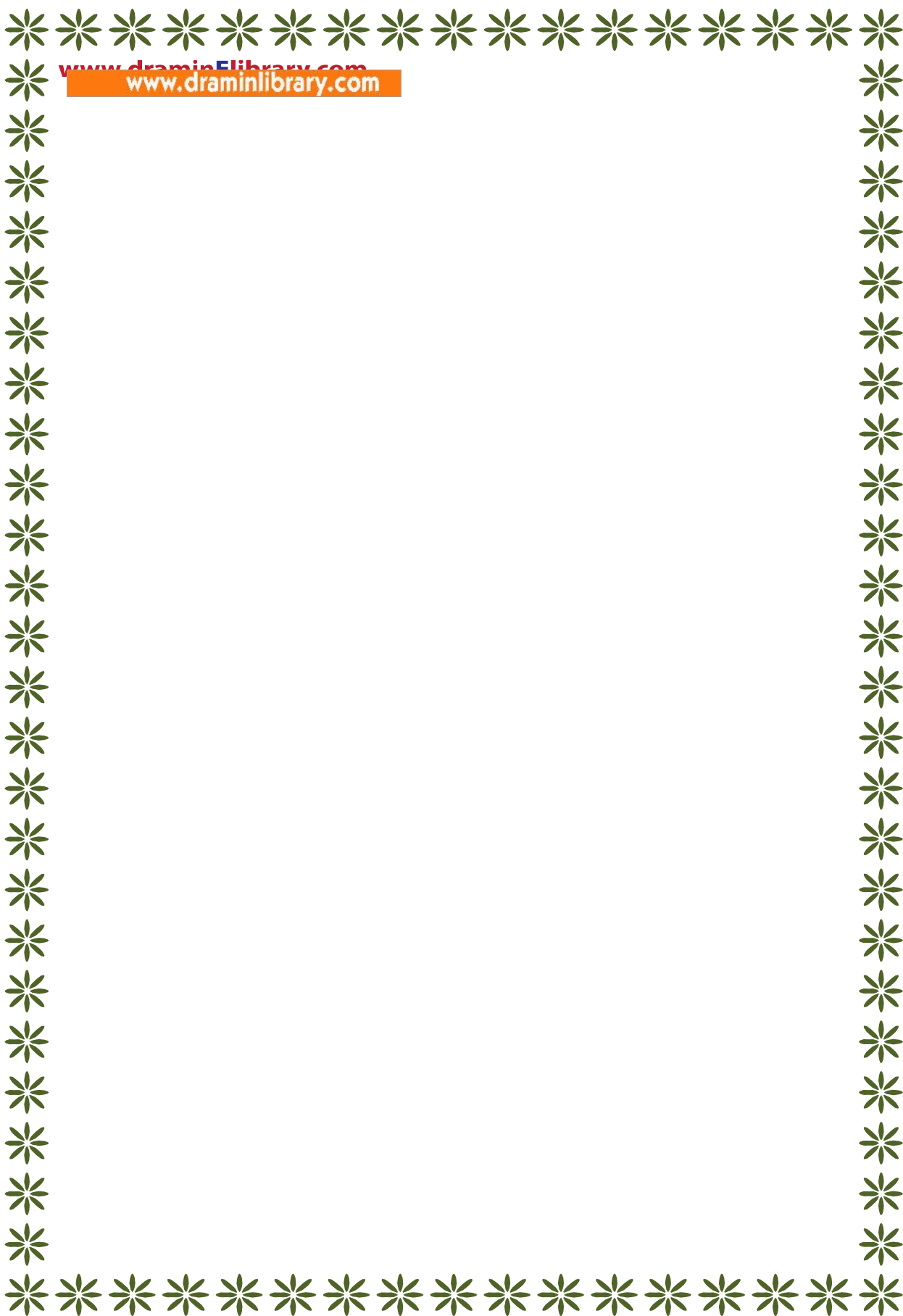
গালিবের কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো অনেক কথাই বলা যায়, কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্যের মূলে যেটি সেটি হল তাঁর ব্যক্তিসত্তার উৎসার,—একই সঙ্গে উনিশ শতকের হিন্দুস্তানের সঙ্গে যুক্ত ও সার্বজনীন—এই কথাটি সংক্ষিপ্ত করে হলেও স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। উর্দুর শ্রেষ্ঠ কবি গালিবের কবিতার একখানা বাংলা সংকলন বাংলা

ভাষী পাঠকের সামনে থাক, এ আমার বহুদিনের কামনা। কারণ যাঁরা উর্দু জানেন না, তাঁরা গালিবের নাম মাত্র জানেন। গালিবের কাব্যাস্বাদের আগ্রহ তাঁদের অনেকেরই অপরিসীম। কিন্তু গালিবের কবিতার কোন বাংলা অনুবাদই ছিল না। ইংরাজী কোন অনুবাদ আছে বলেও আমার জানা নেই। তাই কয়েক বছর আগে আমি নিজেই দীওয়ান-ই-গালিবের তর্জমা শুরু করি। কাজ বেশী দূর এগোয়নি। কিছুদিন পূর্বে বাংলা একাডেমীর সুযোগ্য পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান একাডেমী থেকে গালিবের কবিতার এক বাংলা সংকলন প্রকাশের অভিপ্রায় আমাকে জানান ও এর অনুবাদের দায়িত্ব আমাকে নিতে বলেন। আলী আহ্সান সাহেবের আগ্রহ আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে। আজ যখন 'দীওয়ান-ই গালিবে'র একখানা তর্জমা পাঠক সমাজের সামনে উপস্থিত করতে যাচ্ছি, তখন স্বভাবতই মনে হয় আলী আহসান সাহেবের তাগিদ না থাকলে এ সংকলন প্রকাশে অনেক দেরী হয়ে যেত। এই উপলক্ষে তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এই সংকলনে 'দীওয়ান-ই-গালিব' থেকে পঞ্চাশটি কবিতার অনুবাদ দেয়া হল। কবিতা বলতে আমরা যা বুঝি, উর্দুতে তাকে নযম বলা হয়। গালিবের কবিতাগুলো 'নযম' নয়, সেগুলো গজল (শুদ্ধ বানান কি গযল ?) গজলের প্রাচীনতম রূপ কি ও তা কোন্ ভাষার অন্তর্গত, তা সঠিকরূপে জানা যায় না। তবে একথা সত্য যে, মুসলিম আমলে সাদী, হাফিয প্রমুখ শক্তিশালী কবিদের হাতে গজলের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। ফারসী থেকেই উর্দুতে গজল রীতির আমদানী হয়, একথা সর্ববাদীসম্মত।

গজলে দুই পংক্তিতে একটি ভাবকে সম্পূর্ণতা দান করা হয়। গোটা গজলটিতে এই ভাবে দুই দুই পংক্তি করে যতগুলো জোড় থাকে, ততগুলো ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য। গজলের এই পরস্পর স্বাধীন জোড়-গুলোকে একত্রে ধরে রাখে ছন্দ। ছন্দের কাঠামোতে তারা একটি মাত্র সুতোয় গাঁথা মুক্তামালার মত। গজল ছন্দের একটা বৈশিষ্ট্য হল পংক্তিগুলোর মধ্যে 'কাফিয়া' আর রদীফে'র মিল। 'রদীফ' চরণের শেষ শব্দ বা শব্দ-যুথকে বলা হয়, যা গজলের প্রতি দ্বিতীয়

চরণে ফিরে ফিরে আসবে। আর 'কাফিয়া' হল 'রদীফে'র পূর্ববর্তী শব্দের শেষ শব্দাংশ বা Syllable; 'কাফিয়া' ও 'রদীফে'র সঙ্গে দ্বিতীয় চরণে পুনরাবৃত্ত হবে।

যেমন ঃ

সব্ কাহাঁ কুছ লালা ও গুল্ মেঁ নুমায়াঁ হো গঈঁ,
খাক্ মেঁ ক্যা সুরতে হোঙ্গী কে পিন্হাঁ হো গঈঁ

এখানে 'আঁ' কাফিয়া ও 'হো গঈঁ' রদীফ। নযম রীতি উর্দুতে আধুনিক কালে প্রচলিত হয়েছে। পূর্বে গজল ছাড়া কাসীদা' মসনভী কিতা রুবাঈ প্রভৃতি রীতির প্রচলন ছিল। পরিশিষ্টে গজল সহ উপরোক্ত পদ্য রীতি সমূহ ও উর্দু কবিতার ছন্দ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

আমরা বর্তমান সংকলন 'দীওয়ান-ই-গালিব' থেকে তিনখানা কিতা, একখানা কাসীদা ও ছেচল্লিশখানা গজল সন্নিবেশিত করেছি। অনুবাদে ভাব ও বিষয় বস্তু দু'দিক থেকেই মূলানুসারী হতে প্রয়াস পেয়েছি। কয়েকটি কবিতা গদ্যে তর্জমা করে দিয়েছি।

অনুবাদগুলো বন্ধু সৈয়দ নূরুদ্দীন আমার সঙ্গে বসে দেখেছেন ও এ সম্পর্কে তাঁর উপদেশ থেকে আমি উপকৃত হয়েছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর ঋণ শোধ হয় না।

কবিতার অনুবাদ এমনিতেই দুরূহ। গালিব দুরূহতর। কারণ, গালিবের কবিতার ভাব ও সৌন্দর্য ভাষার এক তীর্যক ভঙ্গী ও ইঙ্গিতের মাধ্যমেই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। ভাষান্তরে সেই বিশেষত্ব প্রতিফলিত করা প্রায় অসম্ভব।

তবু এই সংকলন যদি বাংলাভাষী পাঠক ও সুধী সমাজের কাছে উর্দুর শ্রেষ্ঠ কবি গালিবকে পরিচিত ও প্রিয় করে তোলে, তবেই আমাদের প্রয়াস ও শ্রম সার্থক হয়েছে বলে বিবেচনা করব।

ঢাকা
২৭।৪।৬৩

মনিরউদ্দীন ইউসুফ

দীওয়ান-ই-গালিব

১

কার রচনার শিল্পরীতির শেকায়েত করে চিত্রদল,
প্রতিটি ছবির অঙ্গসজ্জা জানায় করুণ মিনতি তার?

অবিরাম কাটি রাত করি ভোর শীর নদীধারা কোথায় আজো? ১
অতন্দ্র এই বিজন একাকী, অসহ্য এই পাষাণ কালো।

কামনা আমার চুম্বক যেন ওই দেখ হয়ে আত্মহারা
তলোয়ার-রূপী খুন-পিয়াসীরে টানছে কেমন পাগল পারা।

ওগো সচেতন, শ্রবণের জাল যতদূর চাও ছড়িয়ে দাও
কবিতা আমার অলক্ষ্য পাখী—অসীম সুদূরে উড়ছে আজ।

জিন্দানে তুমি বন্দী গালিব, চঞ্চল প্রাণ আগুন হেন,
পায়ের শিকল কেশ-কুণ্ডলী সে-অগ্নিমুখে পড়েছে যেন।

২

বাসনা সকল অবস্থায়ই আভরণ হীন,
চিত্রের আবরণেও মজনু চিরদিনই নগ্ন।

---

১ শিরী'র প্রণয়ী ফরহাদ স্বীয় প্রণয়শর্ত রক্ষার্থে শীরনদীর জলধারা পাহাড়ের অপর পার্শ্বে প্রবাহিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। তার এই অমানুষিক উদ্যমে সে ছিল যেমন একাকী তেমনি অবিশ্রান্ত।

তীর কি হৃদয়-ক্ষতের বেদনা কোন দিন বুঝবে প্রভু,
সে তো হৃদয় বিদীর্ণ করেই উড়ে পালায়।

গোলাপের গন্ধ, প্রাণের কান্না, দীপের ধূম
যা কিছু তোমার আসর থেকে বেরুলো ব্যাকুল হয়ে বেরুলো।

বাসনা ভরা মন আমার দুঃখের আকর হয়েছে,
কিন্তু হায়, বন্ধুরা উপর থেকেই শুধু তার
সামান্য কিছু কুড়িয়ে নিল।

আত্মদান বাসনার পথে এক দুঃসাধ্য মঞ্জিল,
সেও যদি উত্তীর্ণ হওয়া গেল, তবে কি আর বাকী রইলো ?
যে সামান্যকে এতদিন আমি গভীর গোপনে রেখেছিলাম,
হায় গালিব, তাই এখন ঝড়ের রূপ নিতে চাইছে।

৩

কৃতজ্ঞতার ছবি দেখে প্রাণ কোনদিন
প্রবোধ পেল না—
এ'তো সেই শব্দ যার অর্থের উদ্ঘাটন
কোনদিন হয়নি।

তোমার সুন্দর মুখ তোমার ধৃষ্ট চুলকে
অবনমিত করতে পারেনি,
সেই কালনাগিনী বশীকরণের মণির তলে
অবিরাম নৃত্যরত।

কৃতজ্ঞতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য
মৃত্যুই কামনা করেছিলাম,
কিন্তু সেই নির্দয় আমাকে সে অবকাশও
দিতে চাইল না।

আমার জন্য থাকুক কল্পনা, মদিরা আর পাত্র ;
ধর্মপথে পদক্ষেপ করিনি বলে দুঃখ করি না।

মিলনের প্রতিশ্রুতি তুমি দাওনি,
আমি তাতেই সুখী
সুখসঙ্গীতের প্রতি কান পেতে রাখতে
হয়নি বলে নিয়তিকে ধন্যবাদ।

ভাগ্যবিড়ম্বনার অভিযোগ কার কাছে করব বল,
মৃত্যু চেয়েছিলাম, সেও তো আমাকে ফাঁকি দিল।

ঈসা[২] যে মন্ত্র ফুঁকে মৃতকে জীবন দান করে থাকেন
ক্ষীণতনু গালিব সেই ফুৎকারের ঝাপটাও
সহ্য করতে পারল না।

৪

শাহীমহলের খুলেছে দুয়ার, বসেছে সেখানে কবি-আসর,
প্রভু হে রেখো এ মণিমঞ্জুষা খুলে চিরকাল সবার পর।

২ হযরত ঈসা মসীহ অলৌকিক উপায়ে মৃতকে জীবনদান করতেন।

হয়েছে রাত্রি, উজ্জ্বল তারার খুলে গেছে ওই মোহন রূপ,
মন্দিরদ্বার খুলেছে যেন গো, আরতি বাতির লেগেছে ধূম।

দিওয়ানা যদিও হই তবু কেন ধোকায় পড়ব দুশমনের,
স্বজন মুখের হাসির আড়ালে লুকানো অস্ত্র দেখেছি তার।

পাইনি প্রিয়ার কথার অন্ত, বুঝিনিক তার মনের ভেদ,
এই কিবা কম—ফেলে সে ঘোমটা বলছে কত না মধুবচন।

সুন্দর ধ্যানে কেটেছে জীবন, ভেবেছি তারেই পুণ্য বলে,
কবরে আমার তাই কি খুলেছে স্বর্গদুয়ার এমন করে!

বলব কেমনে সে জগৎ কভু চোখেই দেখিনি, তবু তো আহা,
বদনশোভারে খুলেছে ঘোমটা, থাকুক না ঢাকা অলকদাম।

পাশে বসবার অনুমতি দিয়ে কেমন ঝটতি বলে সে শোন,
বিছানো শয়ন তোল মুসাফির বিছাতে যতটা লেগেছে ক্ষণ।

বিরহের রাত কেন গো আঁধার, বিপদ নামে কি আকাশ বেয়ে?
তাই বুঝি যত তারার নয়ন ওদিক পানেই রয়েছে চেয়ে।

বিদেশ বিভুঁয়ে কি সুখ বলতো, যতবার আসে দেশের লিপি
খবর প্রায়ই দুখ-শোক-তাপ, প্রায়শই খোলা সে লিপি-বাণী।

আমি তো তাঁরই উম্মত, তবে কেন রব বল বিফলকাম?—
যে মহাপুরুষ লেগে খুলেছিল রন্ধ্র বিহীন গগনদ্বার।

৫

আমার জ্বালায় তুহিন বাদল মেঘেরা বৃষ্টি ঝরিয়ে দিল,
অগ্নিগিরির উৎসার যত ঘূর্ণাবর্তে তলিয়ে গেল।

আসেনিক প্রিয়া বৃষ্টির লাগি—পূবালী বাতাস নেচে বেড়ায়,
এখানে দারুণ চোখের পানিতে সিথান আমার ভাসছে হায়!

সেখানে সজ্জা কন্ঠভূষণে মুক্তা গাঁথার পড়েছে ধুম,
এখানে অশ্রুবিন্দুর দলে দৃষ্টি আমার করেছে গুম।

রঙীন কতনা ফুল ফুটে তীরে করেছে নদীর স্রোত উজল,
দু'চোখে আমার রক্তের ধারা বইছে এখানে অনর্গল।

এখানে অঘুম—সারা রাত শুধু ব্যথায় ললাটে আগুন জ্বলে,
গভীর আরামে বালিশে সেখানে ফুটে আছে সুখ স্বপ্ন দলে।

বিরহের দীপ কেঁপে কেঁপে জ্বলে এখানে আমার বিজনে হায়,
ফুলের আসরে বন্ধুরা তার কালেরে ধরে যে ফিরাতে চায়।

দুনিয়া সেখানে কামনা রঙীন—ফানুস উড়ায় গগন তলে,
হায়রে এখানে শুকায় গোলাপ, বাতাসে দারুণ আগুন জ্বলে।

সহসা বন্ধু, ঝরলো দু'চোখে এমন যে তাজা রক্ত ধার,
জানোনা কি সুখে নখের আঁচড়ে কলিজা কেটেছি পুনর্বার।

৬

রাত্রে সাকীর প্রতীক্ষায় কেয়ামতের দীর্ঘতা যেন
বিস্তৃত ছিল,
সুরাহীর মধ্যে সুরা মদালশ অঙ্গের মতো
আবেশে এলিয়েছিল।

এতটুকু উন্মাদনায় বিকশিত হয়েছিল
সম্ভাবনার বিপুল জগৎ,
যেন প্রমত্ত মরুর দক্ষিণে বামে ইহ পরকালের
রহস্য মুক্তি পেয়েছিল।

মরু অভিসারে লায়লীর জন্য বারণ কোথায়?
মরুচারী মজনুর গৃহের তো দ্বার বাতায়ন কিছুই নেই।

প্রসাধন সে তো রূপের অপমান,
হাত হেনার আর কপোল সুরভি-রেণুর নিকট ঋণী।

প্রাণের ছিন্নপত্র আমার গানের দমকা হাওয়ায়
কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল,
আহা, সে তো আমার দিওয়ানের
অগ্রথিত কতকগুলো পাতা ছিল।

৭

বন্ধুর সাথে মিলন আমার ভাগ্যে ছিল না,
আয়ু যদি আমার দীর্ঘতর হতো তাহলেও
প্রতীক্ষার অবসান হতো না।

তোমার প্রতিশ্রুতি আমি বিশ্বাস করেছি—
এই যদি জেনে থাক, মিথ্যা জেনেছ।
বিশ্বাস করে থাকলে সেই আনন্দই কি
আমার মৃত্যু ডেকে আনত না ?

মৃদু তোমার চলন ভঙ্গিমা, বন্ধন ছিল ক্ষীণ,
চলে যেতে তুমি কখনই পারতে না
যদি কঠিন হতো সেই বাঁধন।

আহা, তোমার আধোটানা জ্যা থেকে মুক্ত তীর
হৃদয়ে আমার বিদ্ধ রয়েছে,
কলিজা ছিন্ন করে বেরিয়ে যাওয়া শায়ক
কি কখনো এ সুখ দিতে পারতো ?

বন্ধুরা উপদেশ দাতা হয়েছে—এ কেমন বন্ধুত্ব ?
আহা, কেউ যদি সমব্যথী হোত কেউ যদি
আমার দুঃখ অনুভব করতো ?

পাষাণের বুকে গোপন রয়েছে আগুন,
সে যদি অকস্মাৎ বেদনার রক্ত হোত
তবে সেই রক্তের ধারা চিরকাল বইত।

বেদনা হৃদয় মথিত করে, কিন্তু হৃদয় ছাড়িয়ে
কোথা যাব,
প্রেমের বেদনা না থাকলে সেখানে যে
অন্যতর তুচ্ছ বেদনার স্থান হোত।

কাকে বলব বিরহের রাত কত নিদারুণ,
তাই বার বার না হয়ে একবার যদি মৃত্যু হোত
তবে কত ভালো ছিল।

মরণেও অপমান—কেউ তোমার জানাযা পড়বে না,
কবরও কেউ দিবে না,
হায়, আমি যদি সমুদ্রে ডুবে মরতাম।

অহং-এর অতি সন্নিকটবর্তী আপন ও
অদ্বিতীয় সে,
দ্বৈতের ছায়াও যদি থাকত
তবে একদিন না একদিন তাকে চোখে পড়ত।

তাসাউউফের[৩] এই সমস্যা ও এই সমাধান,
গালিব, তুমি যদি মদ্যপায়ী না হতে তবে তোমাকে
অবশ্যই ওলিআল্লাহ[৪] বলা চলত।

৮

বাসনার কত উচ্ছল নৃত্য কর্মের উদ্বেল তরঙ্গ!
মৃত্যু না থাকলে জীবনের এই আস্বাদন থাকত কি?

---

৩ আধ্যাত্মিক মতবাদ বিশেষ।
৪ আল্লাহর বন্ধু অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত পুরুষ।

তোমার এই উদাসীনতার অর্থ কি বলো,
কেন তুমি লীলাভরে শুধু প্রশ্নই করে যাচ্ছ ?

অপাত্রে তোমার অনুগ্রহ, এই আমার অভিযোগ,
তাতেই কি তোমার এই বিরাগ ?

লাজমুক্ত অবাধ দৃষ্টি চাই,
এছাড়া আমার নিরুত্তাপ আকাঙ্ক্ষার
স্ফুরণ হবে কি ?

শুষ্ক কাশবনের প্রজ্বলিত অগ্নি
সে তো ক্ষণিকের,
তোমার প্রেমের সম্ভার সেই প্রেমিকের পায়ে
রাখবে কি ?

আমার নিঃশ্বাস বেখুদী নদীর অধীর তরঙ্গ,
সাকী যদি আমার কথা ভুলে যায়
তাতে অভিযোগ করব কেন ?

বিমুখ প্রিয়ার বসনাঞ্চলে কোন্ আতরের সুগন্ধ !
ভবঘুরে ভোরের বাতাস তাকে আন্দোলিত করুক
কি আমার তাতে আসে যায় ?

প্রতিটি বিন্দুর অন্তর থেকে 'আমি সমুদ্র'—
এই সঙ্গীত উত্থিত হচ্ছে,
আমিও তার—এর মধ্যে প্রশ্নের
অবকাশ কোথায় ?

নির্ভয়ে আমার দিকে চাও—আমার মৃত্যুর দায়িত্ব
আমিই নিলাম,
দৃষ্টির আঘাতে মৃত্যুর জন্য
রক্তমূল্য কি কখনো দিতে হয় ?

হে প্রেয়সী, প্রেম আর প্রতিজ্ঞা তুমি ভেঙে
খণ্ড খণ্ড করেছ,
কিন্তু হৃদয়-কাঁচের ভেঙে পড়ার
শব্দ শুনেছ কখনো ?

ধৈর্যের অহঙ্কার কে করছে বল ?
প্রেমিক হৃদয়ে ধৈর্য কোথায় ?

এই হন্তা সহনশীলতার পরীক্ষা কেন করছে ?
এই সুন্দরী শক্তির প্রলয়কে আকর্ষণের চেষ্টায়
রত হয়েছে কেন ?

হে গালিব, প্রিয়ার প্রতিটি কথাই
প্রাণ-সংহারক—
কি ভাষা, কি ইঙ্গিত, কি ভঙ্গিমা !

৯

বেদনা আমার চায়নি ওষুধ কোন,
বেদনার্তই থাকব, সেইতো ভালো ।

প্রতিপক্ষের সালিশ কেন যে ডাকো,
মিনতি গো প্রিয়া, গালিটি তুমিই দিয়ো ।

কোথা যাব বল, ভাগ্য পরখে আর
তুমিই যখন লুকালে তোমার তীর ?
তাজা এ খবর—ওই আসছেন তিনি,
কোথায় বসাই মাদুরও তো আজ নেই।

আমার সেবা কি খোদায়ী নমরূদের ?
প্রতারণা এই কারে বা জানাই বল।

প্রাণটি দিয়েছি, তাঁর দেয়া এই দান,
সত্য বলি তো, কিছুই হয়নি দেয়া।

ক্ষত শুকায়েছে, থামে না রক্ত ঝরা,
একটু বিরামে বন্ধ হোল কি চলা ?

মন চুরি না কি পথের ডাকাতি এটা,
মন নিয়ে চোর কোথায় যাচ্ছে চলে ?

গজল কবিতা যা হয় একটা পড়ো,
লোকে না বলুক, আজকে গালিব কোথা ?

১০

কিছুই যখন ছিল না তখন
সে ছিল বিরাজমান,
না প্রকাশ পেলে বিশ্বজগৎ
সে হোত প্রকাশমান।

ভাগ্য আমার ব্যর্থ হোত না
যদি না হোতাম আমি,
সম্ভাবনার গর্ভে রইত
আমার দিবস যামী।

অনুভূতি নেই বেদনার যদি
দুঃখে ভাবনা কি বা?
মস্তক যদি লুটায় পায়েতে,
রজনীর পায়ে দিবা।

বহুদিন হোল মরেছে গালিব
তবুতো স্মরণে আসে,
আহা সে বলতো, বাসনা নিত্য
নব নব রূপে ভাসে।

১১

এতটুকু ভূমি অকেজো নয়কো ফুল বনের,
সরু বীথিকাও কতনা ফুলের ব্যথায় নীল।

নেশা ছাড়া বল গণতে কে পারে দিন কুদিন,
ভীরু আঁকে বসে পাত্রের ছবি—রেখার মিল।

বুলবুলি কাঁদে ব্যবসা, হেসে যে কয় গোলাপ—
বুদ্ধি বেড়েছে, কি লাভ হে সেবি' প্রেমের দেবী।

কথাবলা নেশা ছুটেছে আমার, নীরব আমি,
ধূমল প্রদীপ যেন গো পুরানো আফিম সেবী।

কতবার আমি মুক্তি নিয়েছি. আর না প্রেম,
শূন্য জীবন অসহ্য তাহা বুঝেছি শেষে।

হৃদয় শোণিত বিনে চোখে শুধু ধূলির ঢেউ.
এই পানশালা উজাড় বন্ধু, পায়ীর খোঁজে।
ফুলবন তোর আনন্দ দেয় আহা এমন,
এই বসন্ত হয়ত বা কারো নেশা সঘন।

১২

আবার তোমার জলভরা চোখ আমার স্মরণে এলো,
আবার আমার হৃদয় মন বাসনার অভিযোগ নিয়ে
উতলা হোল।

ক্ষণকালের জন্য শুধু কেয়ামতের প্রলয় ঝঞ্চা
প্রশমিত হয়েছিল,
অমনি আবার তোমার বিদায় পথ
চোখে ভেসে উঠল।

আমার বাসনার সারল্য কি নির্বোধ!
আবার সেই মায়াবী কটাক্ষই
আমার মনে পড়ছে।

অসহায়তাই বাধা—আহা, একি পরিতাপ,
মন চায় উচ্চৈস্বরে কাঁদি, কিন্তু অবশ প্রাণে
সে শক্তি কোথায়?

জীবন কোন রকমে কেটেই যেতো,
তোমার চলার পথ কেন আমার স্মরণে এলো?

সেখানে যদি তোমার মর্ত্যের গৃহ
আমার মনে পড়ে যায়।
তাহলে স্বর্গের দ্বার রক্ষীর সঙ্গে কি লড়াইটাই না হবে।

হায়রে, ফরিয়াদ করার সেই শক্তিই আর
প্রাণে নেই,
তাই প্রাণের কথা ছেড়ে হৃদয়ের অন্য জোরের কথা
মনে পড়ছে।

আবার কল্পনা তোমারই পল্লীর পথে
এগিয়ে যায়,
কিন্তু হায়, সে হৃদয় তো আর নেই।

এই বিজনতা সত্যিই বড় দুঃসহ,
নির্জন এই মরুপ্রান্তর আমার ঘরের কথাই
মনে করিয়ে দেয়।

হে গালিব, শৈশবে আমি মজনুকে লক্ষ্য করে
পাথর উঠিয়েছিলাম,
কিন্তু নিরস্ত হয়েছিলাম নিজেরই মস্তকের কথা
স্মরণ করে।

১৩

কাল রাতে প্রিয়া আসরে যেন গো
লাজের প্রতিমা ছিল,
রঙীন ফানুসে বাতির সলতে
ভয়ের কাঁপন দিল।

কবর ছুঁয়ে যে ফুটেছে মেহেদী
দূর হতে দূরে দূরে,
ধুইতে চরণ বুকভরা খুনে
আঁখি তার আজ ঝুরে।

প্রেম সে তো শুধু বাসনার খুন
আর তো দেখি না কিছু,
প্রাণে প্রাণে গাঁথা মালা ঝরে পড়ে
ঝড়ো বাতাসের পিছু।

বিরহ ব্যথার চাইনা ওষুধ
হৃদি খুনে মিটে জ্বালা,
প্রেম প্রিয়াসীর শীতল অর্ঘ্য
খুনিয়া ফুলেরি ডালা।

১৪

ঈর্ষা বলছে হায় প্রিয়া আজ
পরের অঙ্কলীন,
বুদ্ধি বলছে ভেবো না, কালই
হয়ে যাবে সে যে ভিন।

পানশালে আজ চলে উৎসব
পায়ীরা সংজ্ঞাহারা,
মজনু যেন গো মত্ত মরুতে
লাইলীর পেয়ে সাড়া।

ক্ষুদ্র অণুর বক্ষেতে মরু
বিন্দু সাগর প্রায়,

প্রেমের পরশ পেলে তবে তারা
নিজেরে জানতে পায়।

সন্দেহ কেন রইবে বলনা
তোমাতে আমাতে আর,
নত মস্তকে স্মরণ আমার,
তোমার আয়না সার।

আমি আর এই আপদ হৃদয়
বন্য বল্গাহারা,
শান্তি করেছে হারাম সে হায়,
পথে করে দিন সারা।

ফরহাদ ছিল ভাস্কর শুধু
শিরী'র প্রতিমাকার,
নয়তো মরণে বাঁচে কি গালিব,
প্রিয়ার অঙ্গীকার ?

১৫

প্রিয়া প্রসঙ্গ বর্ণনা সেই
আমারি মনের মতো
হায় কি গো আজ বুকের বাসর
ছেড়ে সে বাইরে এলো !

পরের আসরে বহুপানে আজ
ঢুলু ঢুলু আঁখি তার,

মাতাল চোখের পরীক্ষা বুঝি
এতদিনে তার এলো।

মন চায়, আরো উর্ধ্বে মনের
সুখের আসন পাতি,
হায়, আরশের বুকে কেন সেই
আসনের পাত ফেলো।

ভাগ্যে প্রিয়ার দ্বাররক্ষক
পরিচিত পেয়ে গেনু,
হতাদর আর অপমান তাই
সকলি অমিয় ভেল।

হৃদয়ের কথা লিখব কত না
লিখনীতে খুন ঝরে,
মর্মের ছবি বন্ধু গো, তবে
মরমীর চোখে মেলো।

লজ্জা আমার ঢেকে দিতে কেন
দ্বারের পাথর খানি—
হোথায় সরাও। ঘর্ষণে সে তো
ওই যে ক্ষইয়ে গেল।

শত্রু আমার দুর্নাম করে
বন্ধুর কাছে তাই—
কটুকথা যত তার ও আমার
রাখী বন্ধন পেলো।

লোকে বলে, জ্ঞানী বিজ্ঞের হয়
দুশমন নীলাকাশ,
গালিব কি তবে তাদেরি মতন
জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ছিল ?

১৬

মৌসুম আগত, হও প্রাণ খোলা
ওগো সুরা ওগো সুরা।
সুরাহী ছন্দিত কর নৃত্য তালে
ওগো সুরা ওগো সুরা!

কাননে কেমন আজ শাখাশাখী
মাতাল মাতাল সব,
দ্রাক্ষাকুঞ্জ ছুঁয়ে বায়ু মত্ততার
গুটিমালা করে জপ।

মদের নেশায় চুর ভাগ্যহীন
হও যদি, দেখ দেখ,
তোমারি মাথায় ফেলে হুমা[৪] তার
শুভ ছায়া দেখ দেখ!

কি আশ্চর্য মৌসুম এ বর্ষাকাল
প্রাণের গভীরে আহা,

৪ প্রবাদোক্ত পক্ষী বিশেষ। ধারণা প্রচলিত আছে যার মাথায় হুমার ছায়া পড়বে, সে হবে পরম ভাগ্যবান।

সুরার মত্ততা মিশে' উঠে উর্মি
উতলা উতলা আহা !

তৃতীয় তরঙ্গ পাছে আরো এক
ঢেউ এসে লাগে ওই ;
মলয়ে আদুল গায় প্রেমপুষ্প
সুরা পানে নাচে ওই !

ফুলঝাড় দুলে উঠে কল্পনার
বীথিকায় জ্বলে বাতি,
মনে ভাসে, সুরা কন্যা আহা ওই
হেসে হেসে জাগে রাতি ।

চেতনা হারিয়ে যায় হে গালিব,
সবুজ সবুজ ধরা,
মৌসুম আগত, হও প্রাণখোলা
ওগো সুরা ওগো সুরা ।

১৭

লিপি যেই এলো বন্ধুস্মরণ
হিমানী পরশ পেলো,
ধুমল প্রদীপ ধোঁয়ায় যেন গো
সে মুখ মিলিয়ে গেলো ।

অস্থির মন অধীর বাসনা
লুকাও মর্মতলে,
বন্ধু মুখের দীপ্ত প্রভা যে
কভু না সহন চলে ।

গৃহহীন দেখ আমার ছবিটি
দীন দরিদ্র কতো,
বন্ধু, পথের ধূলায় রয়েছি
পদচিহ্নের মতো।

শত্রুর ঘায়ে সে প্রাণ দিলাম—
বড়োই দুঃখ হয়,
বন্ধু বিয়োগে বহুদিন যে গো
মুমূর্ষু পড়ে রয়।

উজ্জ্বল আঁখি মরণ বেলায়,—
তোমরা সাক্ষী থেকো,
বন্ধুর লাগি রেখেছি এ দুটো
সুরার পাত্র দেখো।

দুদিনে যদি অপরেও করে
এমন যত্ন সেবা,
বন্ধু নয়তো শত্রুর তরে
এমন করেছে কেবা?

সে জানাতে চায়, সে পেয়েছে দেখা
তাইতো বারংবার—
বলে সে, বন্ধু আসলে এবারে
দেখাটি পাব যে তার।

দুর্বলতায় অসাড় স্মরণ
দু'চোখ জড়িয়ে আসে,
বলে, বন্ধুর কুন্তলদাম
সুগন্ধ হয়ে ভাসে।

মনের কান্না মনেই গুমরে
নিবিড় নিশীথ নামে,
সে হেসে জানায়, বন্ধু জাগর
উন্নত তার ধামে।

এভাবে শত্রু ব্যথা দেয় প্রাণে
ব্যথিত আমারে পেয়ে,
বন্ধু-স্মরণে সেও ভালো ওগো,
আঁধারে থাকার চেয়ে।

এ গজল গান পিয়ারা আমার
বড় আদরের ধন
প্রতি পংক্তিতে রয়েছে গালিব,
বন্ধুরি আলাপন।

১৮

আজ পরিচিত গোলাপের বনে
নতুন রীতির বাধা,
অনুমতি নেই গায়ক পাখীও
দুয়ারে পড়েছে বাঁধা।

দীর্ঘ শ্বাসের সাথে উঠে আসে
কলিজার তাজা খুন,
তারি তন্তুর জালে ধরা পড়ে
কতনা হৃদয় তৃণ।

সুখ শৃঙ্খলা করছে প্রয়াণ,
শান্তি বিদায় হও,
অশ্রুর বানে ধ্বসবে প্রাচীর,
বন্ধু, তফাৎ হও।

১৭

রূপের বিভায় ঝলসে গেল না
দৃষ্টি বাঁধন হারা,
(ওগো) গরব অনলে তাই তো এ প্রাণ
কস্তুরী মৃগ পারা।

লোকে বলে, আমি অগ্নি-পূজক
আগুনের ধ্যান করি,
(আমার) অনলবর্ষী ফরিয়াদ ছুটে
নিশীথ আকাশ ভরি।

প্রেমের বেদনা সহজ হলে কি
প্রেম বলা যায় তারে ?
(তোমার) শীতল প্রেমের থির বেদনায়
কারো না হৃদয় কাড়ে।

আঘাতের তরে আকুল পরাণ
প্রণয়ীর পথ চাওয়া
(সে যে) অমনি আহত ঈর্ষার তীরে
রেখে তার দাবী দাওয়া।

সুরাহি কন্ঠে ওই যে শোণিত
কেঁপে উঠে থেকে থেকে,
(ওগো) চপল চলনা নিঠুর ললনা
কারে যাও ডেকে ডেকে ?

হায় প্রিয়া তার আঁচল গুটায়ে
(প্রেমের) বাঁধন দিল যে খুলে,
(আমি) যে বাঁধন লাগি দিবস-রজনী
ছিলাম সকল ভুলে।

তারি হাতে আমি দেই আপনারে
যে আমার কথা বুঝে,
(সে যে) রসিক সুজন কাব্যে আমার
মনের মানুষ খুঁজে।

উপবীত পর, গুঁড়িয়ে দাওগো
গুটিকার জপমালা,
(দেখ) উঁচুনীচু ছেড়ে ধরে মুসাফির
সহজ পথের পালা।

ক্ষত বিক্ষত ছিল পদতল
পথে ও প্রবাসে ঘুরে,
(ওগো) প্রণয় ভাগ্য দিল আরো পথ
কন্টকে মুড়ে মুড়ে।

ভুল করে হায় সে দেখে আমার
মনের আয়না মাঝে,
(আহা) ব্যথা জগু নয়, মত্ত পাপিয়া
মনের সুখেতে রাজে।

জ্যোতি প্রপাতের ধারক আমিই
নয় সে পাহাড় তুর,
(ওগো) মহার্ঘ সুরা ধরে রাখা যায়
তেমনি পাত্র মোর।

মাথা ঠুকে ঠুকে মজনু ঘায়েল—
প্রাচীন সে ছবি জানি,
(আহা) মনে পড়ে আজ হে গালিব
দেখে প্রিয়ার প্রাচীর খানি।

২০

উজল তপন প্রয়াস দেখে যে
ব্যথায় হৃদয় কাঁপে,
আমি তো ছোট্ট শিশির বিন্দু
ক্ষুদ্র পাতার মাপে।

গহন কারায় ছাড়েনি য়ুসুফ
আত্মরচনা তার,
য়াকুবের চিঠি, আলো পড়ে সেই
জিন্দান ন'বাহার। ৫

এযুগে আমিও আত্মবিলোপ
শিক্ষার দাবীদার,

৫ পিতা ইয়াকুব যে হারানো পুত্র ইউসুফকে সর্বদা স্মরণ করতেন, তা কারাগারেও ইউসুফের আত্মবিকাশের সহায়ক হয়েছিল।

বিদ্যালয়েয় দেয়ালে মজনু
লিখত ল'আকার। ৬

প্রাণটি আমার যদি সুখ পেত
বেদনা অঙ্গীকারে,
বেদনা শান্তি তরে কেন তবে
ঘুরে ফিরি দ্বারে দ্বারে?

প্রণয়ের দেশে হেন লিপি নেই
যেখানে না আছে লেখা,—
প্রাণ বিনিময়ে মিলবে প্রিয়ার
উদাসীন দিঠি রেখা।

আজ সাঁঝে এই অস্ত লালিমা
দেখে শুধু মনে পড়ে,
বিরহে এমনি ফুলবনে তোর
আগুন পড়ত ঝরে।

বাসনা বিপুল উর্ধ্বে টানিছে
তাই এ অবাধ গতি,
প্রবল ঝন্‌ঝা কেয়ামতে যেন
শহীদের উদগতি।

যেকী বন্ধুরা দিক উপদেশ
পরোয়া করোনা তার,
তোমারো গালিব, অধিকার আছে
আনন্দ বেদনার।

৬। লাইলীর নামের প্রথম অক্ষর।

মাথা ঠুকে ঠুকে মরেছে গালিব
বন্য হৃদয়বান,
পাষাণ প্রাচীর দেখে মনে পড়ে[৭]
তার সে আত্মদান।

২৩

মুক্ত প্রাণের দিগন্তে ব্যথা
ক্ষণকাল শুধু থাকে,
তাই বিদ্যুৎ বেপথু আলোকে
প্রদীপ আমার জ্বালি।

যে আসর কভু ভেঙে গেছে তারি
স্মরণের পাতা হতে,
মানস চক্ষে প্রতিমাগুলোরে
আবার জাগায়ে তুলি।

বড় চঞ্চল কোলাহলময়
জীবনের দিনগুলি,
প্রদীপ শিখারে ঘিরে পতঙ্গ
আসর জমায়ে তুলি।

সন্তোষ নয়, দুর্বলতায়
সন্ধানে যতি পড়ে,
তাইতো এখনো বিরাম শয্যা
বাঁধন দেইনি খুলি।

৭। প্রিয়ার গৃহের পাষাণপ্রাচীরে মাথা ঠুকে ঠুকে মৃত্যু বরণ করা ফারসী-উর্দু কবিদের এক প্রিয় কল্পচিত্র।

মনেরে আমার কারাগার ভাবি,
গালিব, মিথ্যা নয়,
লাখো যে বাসনা বন্দী সেখানে
কেমনে সে কথা ভুলি ?

২৪

সে বিরহ আর সে মিলন বল কোথা ?
সেই দিনরাত সে মাস বছর নেই।

মন দেয়ানেয়া প্রাণ বিনিময় হবে—
কোথায় প্রিয়ার সুন্দর মুখ সেই ?

মন ছাড়া বল, মনন কোথা সে পাবে ?
মত্ততা আজ কারেও দেয় না ছোঁয়া।

যে মানুষ মনে জাগাতো উদ্দীপনা,
অভাবে তার যে কল্পনা হোল ক্ষীণ।

প্রেম পাশা সেতো ছুটে গেছে হাত থেকে,
হারজিত খেলা খেলব, কড়ি তো নেই।

জীবিকার কথা মিছে ভাবি দিনে রাতে,
কোথা সংসার, কোথায় পাগল এই !

ভেঙে গেছে দেহ, গালিব বৃদ্ধ আজ,
অঙ্গে তার সে গৌরব কোথা আর ?

২৫

মনের কথাটি খুলে বলো কভু
নেশায় যখন থাক,
না হয় আমিই বলব ফেলে গো
যে কথা বলার ছিল।

করো না গর্ব উপরে উঠার
আরো যে চলতে হবে,
রয়েছে নীচল—গভীর আঁধার
দিনের আলোর পিছে।

ঋণ করে করে নেশা করি আমি
জানতাম একদিন,
রঙীন সুরার রঙনে আমার
দুনিয়া রঙ্গীন হবে।

ব্যথা-সঙ্গীত তারেও হে মন,
স্বাগতম করো আজ,
একদিন এই বীণার তার যে
অসাড় নীরবে রবে।

কাঁদা ছুঁড়াছুঁড়ি জানি গো বন্ধু,
স্বভাব ছিলনা তার,
শুরু যদি তুমি করেছ গালিব,
এখন সইতে হবে।

২৬

আমার ঘোরার প্রতিকার নেই
যতই চেষ্টা কর,

শিকল পরাও পায়েতে কিংবা
বেড়ী ও চক্র ধর।

মরুচারী আমি মজনু যেন গো
দিনরাত ঘুরে ফিরি,
দৃষ্টিতে হারা পথের চিহ্ন
পথহীন বিভাবরী।

বেদনার স্বাদ মিটল না আহা,
সময় ফুরিয়ে গেল,
তলোয়ার হেন তীক্ষ্ণ ও সরু
পথরেখা যেই এলো।

মাথার এ ক্ষত যন্ত্রণা দেয়
পাথর কি নেই কোথা ?
শোণিত পাতের আকাঙ্ক্ষা আনে
কোন্ সে অজানা ব্যথা।

উদ্ধত হতে অনুমতি দেয়
যখন বঁধুর দয়া,
তখন কি সাজে শরম ও নতি
দুর্বলতার ধুয়া ?

বল হে গালিব, নাসিখের মতো
মীর হোল কবি গুরু,
"দুর্ভাগা সেই যে করেনি আজো
আচরণ তার শুরু।"

৮। কবি-নাসিখ মীর তকীকে গুরু বলে ভক্তি করতেন। গালিব নিজেও মীরের কবি প্রতিভাকে উঁচুদরের বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

২৭

যেখানেই দেখি তোর পদতল ছাপ,
সেখানেই চোখে পড়ে ফুলের প্রতাপ।

যখন হাসিতে তোর গালে পড়ে টোল,
তখনি মরমে তৃষ্ণা জাগে যে অতুল।

তোমার এ সীনাটান সুঠাম উদয়,
নিভু নিভু করে দেয় হাশর প্রলয়।

কি দেখ আরশি মাঝে ওগো প্রিয়তমা,
আমার দু'চোখে দেখ তোমার রঙিমা।

প্রভাতে যেমন পথে পদচিহ্ন খুলে,
বিলাপে তেমনি প্রাণ গহন উছলে।

গালিব দরিদ্র বেশে দেখে নিতি নিতি,
দয়ায় কারো কি প্রাণে উথলে পীরিতি!

২৮

দুয়ারে তোমার রব চিরকাল
একটু করুণা লাগি,
আমি কি পাথর অনুভূতিহীন
লাজে উঠব না জাগি?

দ্বার থেকে দ্বারে ফিরি অসহায়
কত আর প্রাণে সয়,
আমি তো মানুষ—পেয়ালা নই যে
মদেরি গাইব জয়?

হে প্রভু কেন এ কাল করে ক্ষয়
আমার প্রাণের রেখা,
কালের গ্রন্থে কাহিনী আমার
দু'বার হবে কি লেখা ?

শাস্তি আমার অনন্ত কেন
কেন চির বন্ধন ?
পাপী বটে আমি, তাই বলে নই
কাফির চিরন্তন !

আমার মূল্য কম বেশী কেন
কেন এই অবহেলা,
আমি কি স্বর্ণ মণি মাণিক্য
মুক্তা সাগর বেলা ?

নয়নে আমার চরণ তোমার
রাখবে না কেন প্রভু,
চন্দ্র সূর্য তারারা আমার
মর্যাদা পাবে কভু ?

পদ চুম্বনে কেন কর মানা
পাপী তাপী যা'ই আমি,—
অমল আকাশ অমলতর কি
আমার চেয়ে কি দামী ?

উচ্চারো তুমি গালিব, প্রভুর
অনুপম গুণগান,
সেদিন গিয়েছে, সন্দেহ ছিল,—
জীবন কি তাঁরি দান ?

২৯

লালা ও গোলাপে রমণীয় রূপ
সব কি প্রকাশ পেলো ?
কতো সে মোহন মূর্তি না জানি
গোপনেই রয়ে গেল।

আমারো স্মরণে ভেসে উঠে আজ
অতীত সুখের স্মৃতি,
আহা, কোথা গেল আসর-উজ্জ্বল
চিত্র-রঙীন গীতি।

সাত সখী তারা দিনের আলোয়
আকাশে লুকিয়ে ছিল,
রাতের বেলায় কি জানি উলাসে
বসন উতারি দিল।

যদিও য়াকুব লয়নি খবর,
তবু তার আকুলতা,
য়ুসুফ কারায় চোখ পেতে রাখে
আলোকছিদ্র যথা।[১]

প্রণয়ে ঈর্ষা জগতের রীতি
কিন্তু জোলেখা খুশি,—
য়ুসুফকে দেখে মিসর নারীরা
হৃদয় গিয়েছে তুষি।

১। হযরত ইউসুফের বিরহে পিতা হযরত ইয়াকুবের চোখ জ্যোতিহীন হয়েছিল। কয়েদখানার প্রাচীর সংলগ্ন গবাক্ষের মতো সেই অন্ধ চোখ সর্বদা খোলাই থাকত, আর তার অন্তরালে অব্যাহত থাকত ইউসুফের স্মৃতি; অন্ধ চোখের এই উপমা অদ্ভুত সুন্দর।

আঁখিজলধারা বইতে দাও গো,
বিরহের কালো রাতে
এ দুটি উজ্জ্বল বাতির আলোক
জাগুক আমার সাথে।

এই সুন্দর নারীরাই যদি
স্বর্গের হুরী হয়,
যত ব্যথা তারা দিয়েছে সকলি
পীড়নে করব জয়।

ঘুমটি যে তার, তারি তো স্বপ্ন
রাত্রিও তারি ধন,
যার বাহু পরে তোর কালো চুল
এলায়েছে ওগো মন!

আমি যেই গেছি ফুলের বাগানে
অমনি পাখীরা সব,
আমার কাঁদন সুরে পাঠ করে
গজল গানের স্তব।

আনত সে আঁখি জানিনা বন্ধু
কেমন করে যে হায়,
ভুরুর তীক্ষ্ণ তীর হেনে চলে
আমার মরম গায়।

যে 'আহা'রে আমি রেখেছি গোপন
গভীর বুকের তলে,
সূচের মতন সীবন যে তার
দিনরাত শুধু চলে।

প্রিয়ার দুয়ারে বার বার মানা,—
কত আর মিঠে বুলি
বলব, বল না যত ছিল জানা
উজাড় করেছি ঝুলি।

প্রাণদায়ী সুরাপাত্র বন্ধু
খুশীতে যে হাতে লয়,
তাহার হাতের প্রতিটি রেখাই
রক্তধমনী হয়।

একত্বে আমি করি বিশ্বাস,
সাম্প্রদায়িক ভেদ
কেটে গেলে, তবে ঈমানের জোর
ঘুচাবে সকল খেদ।

দুঃখের সাথে ঘর করে আমি
দুঃখ করেছি জয়,
বিপদ সাগরে ডুবলেই তবে
জীবন সহজ হয়।

গালিব, বন্ধু কত আর কাঁদ
এমন কাঁদলে তবে—
সংসারবাসী গৃহীর ঘর যে
উজাড় বিরান হবে।

৩০

আহা, মানুষেরি প্রাণ তাইতো বন্ধু,
এমন করে সে জ্বলে,

পাষাণ পাদপ নই, কাঁদি তাই
আকুল অশ্রুজলে।

ওগো, নয় মন্দির মসজিদ নয়
নয় কারো ঘর বাড়ী,
বসেছি পথের প্রান্তে, কেন গো
স্থান নিয়ে কাড়াকাড়ি ?

যদি মুখের দীপ্তি মধ্যদিনের
সূর্যপ্রভার মতো,
তবে কেন আর ঘোমটা আড়াল
কেন বা শরম অতো ?

তোর হাতে খঞ্জর তূণে ভরা তীর
একি বিজয়িনী রূপ !
কোন্ সে সাহসে সমুখে দাঁড়াবে
তোমারই প্রতিরূপ।

ওগো, আয়ুবন্ধন দুখকারাগার
মূলতঃ দুটোই এক—
মৃত্যুর আগে কোথায় মুক্তি ?
দুখের স্বরূপ দেখ।

তোর সুন্দর মুখ স্বভাব কোমল,
মিথ্যা প্রেমিকে কভু
করনি পরখ, আছে বিশ্বাস
নিজের উপরে তবু।

বঁধু, তোমার রয়েছে অভিমান আর
আমার গর্ব আছে,

পথে তাই কথা বলি না, তুমিও
ডাকনি তোমার কাছে।

আহা, হোক বিধর্মি পাপাচারী, তবু
তারেই লেগেছে ভালো,
ধার্মিক আর সুজন থাকুন
নিজ গৃহ করে আলো।

আহা, এতো কাঁদ কেন? অকেজো গালিব
গেছে যদি মরে গেছে,
সত্যি বলতো, তারে ছাড়া কোন্
কাজটি বন্ধ আছে?

৩১

চুমু নিতে হয় এমনি করে যে
অস্ফুট কলি গো, একি!—
কাছে এসে তবে দেখাও কেমন,
দূরের কথাটি মেকী।

পুছব কি তারে মন দেয়া নেয়া
কেমন করে যে হয়?
প্রতি অঙ্গ ও ভ্রুভঙ্গী তার
সে গোপন কথা কয়।

আসুক সে রাতে মত্ত মাতাল
চোখে ঢুলু ঢুলু নেশা,
না আসুক সাথে প্রেমিকটি তার
মনের অঙ্গে মেশা।

সখা সনে রাত কাটলো কেমনে
ওগো সুন্দরী বল,
যেই জিজ্ঞাসা অমনি বিলোল
কটাক্ষ তার হোল।

কেননা বসব চুপচাপ আমি
রাতের আসরে তার,
নীরব যে তার ওষ্ঠ অধর
আধো খোলা আঁখি-দ্বার।

বললাম আমি, পরের প্রবেশ
অনুচিত হবে আজ,
নিষ্ঠুর প্রিয়া বলে, পর তুমি,—
মাথায় পড়ল বাজ।

জিজ্ঞাসে প্রিয়া, সংজ্ঞা বিলোপ
বলতো কেমনে হয়?—
বাতাস বাড়ালো নেশার আমেজ
কেমনে সংজ্ঞা রয়?

প্রেমিকার ঘরে থাকব কেমনে
প্রেমের রীতি না জেনে,—
পদচিহ্নর দীনতা ও দিঠি
সে দিল সমুখে টেনে।

যদি তুমি বোঝ মিলনে কামনা
কমে যায়, তবে দেখ,
নদীর গর্ভে উর্মিদলের
আকুলি বিকুলি দেখ।

যে বলে উর্দু ফারসীর কাছে
দাঁড়াবার মতো নয়,
বলছে গালিব দেখাও গো তারে
এমনি করে তা হয়।

৩২

রজত বরণী প্রিয়ার পায়ের
পাদোদক পানি চাই,
তা থেকেও করে বঞ্চিত প্রিয়া
বলতো কোথায় যাই ?

কি সরল প্রাণে প্রাণ দিল আহা,
ফরহাদ,—পায়ে পড়ি,
ভাঙল না কেন হায় সে বুড়ীর
পা দুটি দুঃখে মরি।[১০]

পালিয়েছিলাম দূর হতে দূরে
তাই বুঝি এত দিনে,
হয়েছি বন্দী,—দস্যুর পদ
সেবা করি রাতে দিনে।

১০। প্রেমিক ফরহাদ যখন পাথর কেটে কেটে শীর নদীর ধারা পাহাড়ের অপর পার্শ্বে প্রবাহিত করার জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে ও সফলতার প্রায় প্রান্তঃসীমায় এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন শিরীর অপর প্রণয়ী খসরুর নির্দেশে তার জনৈক পার্শ্বচর শিরীর বৃদ্ধা ধাত্রীর রূপ ধরে ফরহাদকে বিভ্রান্ত করার জন্য শিরীর মৃত্যুর এক মিথ্যা সংবাদ তাকে জানায়। এই সংবাদ শুনে ফরহাদ মাথায় কুঠারাঘাত করে আত্মহত্যা করে।

ক্ষতশান্তির প্রলেপের খোঁজে
এতই হেঁটেছি হায়,
পদতলযুগ ক্ষত বিক্ষত
শিকল পরেছি পায়।

আহা, সে আমার মরুবিচরণ
চপল চলন স্মৃতি—
কাফনের তলে কবরে আমার
কাঁপায় চরণ দুটি।

বসন্তে আহা ফুলের বাহার
এবারে লেগেছে কতো,
গায়ক পাখীর চরণ জড়ায়
ফুলজালে শত শত।

করেনি যাত্রা কোন প্রেমিকের
স্বপ্নে সে কাল রাতে,
সেই বেদনায় পদযুগ তার
বেপথু আজ এ প্রাতে।

গালিব, তোমার বাণীতে কেন না
মাধুরী ক্ষরিত হবে,
কবি খসরুর পাদোদক পানি
তোমার পানীয় যবে।

৩৩

এমন জায়গা খুঁজে নাও তুমি
যেখানে কেহই নেই,

সমব্যথী কিবা সমভাষী আর
বন্ধু স্বজন নেই।

এমন ঘরের প্রয়োজন আজ
নেই যার চাল চুলো,
প্রতিবেশী কিবা সহায়তাকারী
না থাকুক, সেই ভালো।

রোগে শোকে কেউ দেখবে শুনবে
এমনো যেখানে নেই,
সেখানেই করো বসবাস, কেউ
মরণে কাঁদার নেই।

৩৪

মসজিদ পাশে শোভন জেনো গো
উতল শরাবখানা,
ভুরু পাশে আছে যেমন বন্ধু,
নয়নের ঝিল টানা।

হয়েছ তুমিও প্রেমাকুল তবে,
বেসেছ কারেও ভালো,
এবারে আমার ব্যথাই তোমার
হরণ করবে আলো।

হে আকাশ, দাও কিছু প্রতিদান
—আশাহত চিরদিন,
অতীত আঁধার কিনারে বাজুক
একটু আলোর বীণ।

সুন্দর মুখ আঁকার লোভেতে
শিখেছি চিত্রলেখা,
চাই উৎসব, সুন্দরীদের
মিলবে যেখানে দেখা।

সুরায় আমি যে সুখ চাই বঁধু,
কে বলে এমন কথা ?
দিন রাত চাই মত্ততা শুধু
ভুলতে হৃদয় ব্যথা।

থাক না গোলাপ মুখী ও পলাশে
রঙের বিভেদ রাশি,
সকল রঙেই বসন্ত তার
এঁকেছে মোহন হাসি।

আত্মহারার দৃষ্টি যেমন
রয় গো, মাটির পরে,
প্রার্থনা কাম্যে তেমনি সে থাক
সুদূর কা'বার ঘরে।

রূপের পেয়ালা ঘৃণিত হোক
যে মদ রয়েছে তাতে,—
অরূপের স্বাদ করুক গ্রহণ
সাধক দিনে ও রাতে।

ফুল শোভা জাগে যেমন গালিব,
গোপন মুলের যশে,
বাণীর বিভব ফুটুক তেমনি
নীরব মর্মরসে।

৩৫

অবসর মিলে একটু যখন
দুঃখ বেদনা নাশে,
মাথা তুলে চাই আকাশে, তখনি
ব্যথিত স্মরণ আসে।

আমার বাণীর মর্ম কেমনে
প্রিয়ার গোচর হবে,
প্রতিটি লিপিকা জ্বালিয়ে ফেলার
শপথ করে সে যবে।

রেশমী কোমল কাপড়ে তবুও
আগুন লুকানো যায়,
ব্যথা অঙ্গার মনের পরতে
কভু না লুকায় হায়।

বলে সে হৃদয় ক্ষত দর্শনে
এবার বেরুব আমি,
দু'চোখে আকুল আগ্রহ তার
ফুটছে দিবস যামী।

উদ্ধত প্রিয়া, আগমনে তোর
বাসনা উথলে উঠে,
তাই কি আসা ও যাওয়ার ভূমিকা
ঝরছে কুঁড়ি না ফুটে?

জীবন তো ছিল প্রেম পরিণয়
প্রতিমা ভজন আর,

হে আকাশ, কেন ঝন্‌ঝা তুফানে
সকলি ডুবালে তার ?

কি কব গালিব, জগতের রীতি
সময়ের ব্যবহার—
ভালো যার করি সে করে মন্দ
বল কি করব আর ?

৩৬

হায়রে, আমার দুখে আজ তোর
অঘুম রজনী যায়,
সুন্দর প্রিয়া, কোথা গেল তোর
আনমনা ভাব হায় !

সইতে যদি এ দুর্বহ ব্যথা
শক্তি ছিল না তোর,
সমব্যথী হতে মিলন রাত্রি
কেন বা করলে ভোর ?

কেন মনে এলো আমার প্রণয়
দীর্ঘ দিনের পরে,
দুশমনী কেন কিনে নিলে আজ
বন্ধুতা ভ্রম করে।

আজীবন রবে প্রেম পাশে বাঁধা
তাই কি ভেবেছ বঁধু
এ ছার জীবন বন্যার জল
ভেবে কি দেখেছ কভু ?

জীবনের এই জল ও বাতাস
বিষের মতন লাগে,
দক্ষিণা আর পূবালী ভেঙেছে
তোমার প্রণয় রাগে।

আহা, কোথা সেই বসন্ত আজ
কুসুম ফোটানো হাওয়া,
গোলাপের দলে হায়, দেখি একি
তোমার কবর ছাওয়া!

প্রেমের খেলায় সেই লুকোচুরি
খতম হোল কি আজ,
মাটির ঘোমটা মুখে টেনে বুঝি
লুকালে শরম লাজ?

বুঝি অভিসার কলঙ্ক দুখে
লুকালে ধরণী তলে,
শেষ করে গেলে প্রণয়ের রীতি
মরণ ভূমিকা ছলে?

তূণে আর নেই নয়নের তীর
তার লাগি কোথা যাব?
হায় রে, জীবন জাগানো সে ব্যথা
জীবনে ফিরে কি পাব?

কাটিবে কেমনে দারুণ বর্ষা
আঁধার যামিনী বল,
বিরহ মেঘে কি তারা গোণা চোখ
চির আঁধিয়ার হোল?

বাজেনাক বাণী কর্ণে, দু'চোখে
রূপের আলো না পড়ে,
একটি মাত্র হৃদয়ে বল না
কত ব্যথা আর ধরে ?

তরুণ সূর্য এখনো প্রণয়ে
আঁকেনি অরুণ রেখা,
হায়রে গালিব, এতো সকালেই
ফুরাল ভাগ্য লেখা ?

৩৭

অস্তিত্ব দিগন্তে আমি
বিস্ময় বাসনা হয়ে রই,
অদেখা আকাশে লীন
বিলাপের পাখার স্পন্দন।

হেমন্ত বসন্ত কিংবা হোক না সে
যে কোন মৌসুম—
এখানে কেবল আমি
পিঞ্জর ও পাখার ক্রন্দন।

বিলাপে কাড়ে না মন,
প্রাণ কাঁদে আকস্মিক টানে,
মিনতি ভাষণে, বন্ধু, মিথ্যা তুমি
হয়ো না মগন।

আমার হতাশা দুঃখ
নবাশার দিগন্ত উদয়,
কালো রাত টেনে আনে
ফুটফুটে উষার লগন।

৩৮

প্রেম নয় এ উন্মাদনা—তোমার দেওয়া এই কলঙ্ক
মাথা পেতে নিলাম,
কিন্তু জেনে রেখো আমার এই কালিমাই
তোমাকে আলোকিত করেছে।

আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো না
আর কিছু না হয়, শত্রু সম্পর্ক—
সেও তো ভালো।

আমার সঙ্গে মিলনে যদি তোমার অপমান,
তবে লোক সমাজ বর্জন করে
সংগোপনেই এসো।

অপরের সঙ্গে তুমি যদি প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ
তবে তাই থাক,
আমি তো আমার দুশমন নই যে তাতে বাদ সাধব।

যা কিছু সম্পর্ক নিজের অস্তিত্বের সঙ্গেই
তা গ্রথিত হোক,
পরিচয় আর উদাসীনতা দুই-ই।

মানলাম, জীবন বিদ্যুতের মতো চঞ্চল,
কিন্তু তবু হৃদয়ের খুন ঝরাবার
প্রচুর অবকাশ তাতে পাওয়া যায়।

দুঃখের জন্য প্রেম কি বর্জনীয়?
প্রেমে যদি মুক্তি না থাকে, তবে তাকে
নিরেট দুঃখ বলেই মনে করব।

হে নিষ্ঠুর নিয়তি, কিছু তো দাও,
প্রেম যদি না থাকে তবে অন্ততঃ
দুঃখ দিয়েই মান রাখো।

আমিও সব কিছু সইবার অভ্যাস করে নিব,
প্রেমের প্রয়োজন যদি তোমার
ফুরিয়েই গিয়ে থাকে দুঃখ করবো না।

হে গালিব, তবে হাসি পরিহাসেই রাত্রি কেটে যাক,
মিলন যদি ভাগ্যে না থাকে, তবে অন্ততঃ
তার আকাঙ্ক্ষাই জেগে থাকুক।

৩৯

মনের গহন ছেড়ে তোর দিঠি
প্রাণের গহন ফুঁড়ে,
এক তীরে প্রিয়া ঘায়েল হলেম
সুখেতে মরম ঝুরে।

বিরহে দু'ফাঁক হয়ে গেল হৃদি
যবনিকা ছিঁড়ে গেল,
বেদনা আমার গোপন বেদন
অবাধে ঘুচিয়ে দিল।

সেই সারা রাত সুরা মত্ততা
ভোরের স্বপ্ন আর,
বন্ধু গো জাগো, সে আয়েশ গত
সে দিন করেছো পার।

৭—

বন্ধুর দেশে উড়ায়ে এনেছ
আমার দেহের মাটি,
হে বাতাস, গেছে পাখা ও পালক
মনের বাসনা খাঁটি।

মোহন চলন ভঙ্গিমা দেখ,
গোলাপ কুঁড়ির দলে—
ঈর্ষা জাগানো পদ উর্মিরা
ভাসিয়ে দিয়েছে জলে।

সুন্দর পূজা করত তারাই
দৃষ্টি যাদের ছিল,
স্থূল প্রয়াসীরা আজকে তাদের
কোথায় হটিয়ে দিল ?

দৃষ্টি সেখানে নিজেই টেনেছে
প্রিয়ার নেকাবখানি,
মুখেতে যখন আলুলিত হোল
বিবশ চোখের বাণী।

আজ ও কালের বিভেদ ঘুচলো
তুমি যবে গেলে চলে,
সময় বিলোপ কেয়ামত যেন
জীবনে পড়লো ঢলে।

কালের প্রভাব পড়েছে গালিব
তোমারো উপরে আজ,
কোথা যৌবন, কোথা গেল সেই
উতল সকাল সাঁঝ ?

৪০

কোন আশা নেই, কিছুই হবে না পুরা,
নেই কোন পথ সমুখে কোথাও খোলা।

মরণ মেগে তো আছে গো, একটি দিন,
রাতভর তবে ঘুমটি কেন না আসে ?

নিজেরেই দেখে একদিন হাসি পেত,
আজ কেন হাসি কিছুতেই আসেনাক ?

জানি উপাসনা ধর্ম-ই খাঁটি, তবু
জানিনাক কেন মনটি সে দিকে নেই।
অকারন নয় আমার নীরব থাকা,
না হলে আমি কি কথাও বলতে না'রি ?

কাঁদিনাক কেন, পুছে সে বারংবার,
কাঁদি না বলে কি করবে অত্যাচার ?

কলিজার দাগ যদি বা চোখে না পড়ে,
পোড়ার গন্ধ পাওনি বন্ধু, তার ?

আমি আজকাল সেখানেই পড়ে আছি,
যেখানের থেকে খবর কিছু না আসে।

মৃত্যু আশায় মরছি দিনে ও রাতে,
ওই আসে ওই, তবুও সে আসেনাক।

কোন্ মুখে তুমি যাবে হে গালিব, কা'বা
শরম তোমার আসে না মরম ছেয়ে ?

৪১

অবুঝ ও মন, কি হয়েছে তোর বল,
চুপটি থাকার ওষুধ আছে কি বোকা ?

আমি তারে চাই, সে রাখে ফিরায়ে মুখ,
খোদা, দুনিয়া কেন যে এমন বাঁকা ?

আমার মুখেও বলার ভাষাটি আছে,
পুছে যদি কেউ, আমি কি বলতে চাই ?

তুমি ছাড়া যদি কিছুই নেইক আর,
হে খোদা, কেন এ কোলাহল তবে বল ?

সুন্দর মুখ নারীরা এমন ধারা,
অভিনয় আর ভঙ্গিমা কেন করে ?

মেঘ কালো চুলে এতো ঢেউ কেন উঠে,
কাজল কোমল অথির চাউনি কি বা ?

লালা ও গোলাপ কোত্থেকে এলো আহা,
আকাশে বাদল বাতাস কি ?—তাও বল।

আমি চাই তার প্রসন্ন হাসিটুকু,
যে জানে না প্রেম হাসিটি কেমনে হাসে ?

দান কর ভাই, তোমার কুশল হবে,—
এ ছাড়া ফকীরে আর কি বলেছে, বলো ?

প্রাণটি আমার বিলায়ে দিলাম পায়ে,—
আমার দোআ তো এ ছাড়া অধিক নয়।

মেনেছি গালিব, কিছুই নয় এ ফাঁকা—
বিনে পয়সায় হাতে এলে দোষ কি বা।

৪২

মরণেও যদি তৃপ্ত নও গো,
সখি তবে শোন শোন,
আরো পরীক্ষা দিতে রাজি আমি
মনেতে আছে কি কোন ?

আশা ফুলবনে চয়ন করিনি
যদিও রঙীন ফুল,
দু'চোখে রূপের পরম পরশে
কখনো করিনি ভুল।

সাকী যদি নেই আজকে আসরে
দুঃখ কেন বা কর,
অধরে পাত্রে রঙীন শরাব
নিজ হাতে তুলে ধর।

লাইলীর কালো তাঁবুতে জ্বলেনি
প্রদীপ যদি বা রাতে,
মজনু প্রাণের শিখায় তো ওই
মরু অঞ্চল ভাতে।

ঘরের দীপ্তি কোলাহলে—তাই
না যদি বিয়ের গীতি,
শোক গাথা হোক, কাঁদনের রোল
তাও তো প্রাণেরি রীতি।

প্রশংসা আর প্রতিদান আমি
চাইনা বন্ধু, কারো,
কবিতা আমার অবোধ্য বলে
না লাগুক কারো ভালো।

সুন্দরীদের সহবাসে যদি
কেটে যায় কটি দিন,
ভাবিনা গালিব, পূর্ণ হলো কি
বয়সের শেষ দিন?

৪৩

শিশুর খেলা এ-দুনিয়া বন্ধু,
আমার চোখের পরে,
দিনরাত এই সুন্দর খেলা
নন্দিত করে মোরে!

সোলায়মানের উড়ন্ত খাট
আমার চোখে না যাচে,
ঈসা মসীহের অলোক কীর্তি
কিছু না আমার কাছে।

বিশ্বের এই রূপের পশরা
ঢক্কা নিনাদ শুধু,
বস্তুর এই অদ্ভুত পাহাড়
মরীচীকা মায়া শুধু।

আমার চলায় ধুলা উড়ে ঢাকে
সাহারা মরুর ধূলি,

আমার চোখের জলধারা বয়
সাগরে তুফান তুলি।

আমারে পুছনা বিরহে তোমার
কি দশা আমার হোল,
মিলন দিনের স্মৃতি মনে করে
তুলনা সে গড়ে তোল।

সত্যি বলেছ, গর্বিত আমি
শতেক রাজার চেয়ে,
তোমার মতন প্রতিমা যখন
বসেছে দু'চোখ ছেয়ে।

দেখবে তখনি উৎসারে কিবা
রঙীন প্রেমের বাণী,
পাত্র ও মদ রাখবে যখন
আমার সমুখে আনি।

ঈর্ষারে কেউ বিরক্তি বুঝে
তাই তো বলিনা আর—
"আমার সামনে কোন দিন তুমি
নিয়োনা নামটি তার।"

ঈমান আমারে বাধা দেয় আর
কুফর নিয়ত টানে,
পেছনে সে রাখে কা'বার ঘরটি
সমুখে গীর্জা আনে।

প্রেমিক আমি যে, প্রতারিত নই
প্রিয়ার ছদ্ম বেশে,

মজনুরে বলে মন্দ লাইলী
আমারি সমুখে এসে।

মিলনে সবাই তৃপ্তি জানি গো,
আমি চাই সেই দিনে,
আসুক মরণ কৃতার্থ হব
বিরহে তোমারে চিনে।

হৃদয়ে লহর দরিয়া বন্ধু
ঊর্মি মাতাল আজ,
এখানেই শেষ নয় গো, দেখনা
কি আনে আগামী সাঁঝ।

কাঁপে দুর্বল অক্ষম হাত
চোখে তবু রঙ্ আছে,
পাত্র ও মদ রেখে দাও তাই
আমার চোখের কাছে।

বন্ধু আমার মর্মগ্রাহী সে
নর্ম সখীও সে যে,
মন্দ বলো না গালিবে তোমরা
ভালো সে আমার কাছে।

৪৪

মরিয়ম-সুত থাকুন নিজেরে লয়ে,
আমার দুখের ওষুধ কোথাও নেই।

বিধি বিধানের আওতায় সারা দেশ,
(তবু) এমন ঘাতকে শাস্তি কি
দিবে বলো

চলনটি যার আকর্ণ-টানা তীর,
তার মনে বল, আসনটি কা'র হবে ?

মহা অপরাধ যেখানে মুখটি খোলা,
সেখানে নীরবে শুনেই তো যেতে হবে।

মত্ততা মাঝে কতো কি যে বকে যাই,
হে খোদা, সে সব অবোধ্য যেন হয়।

মন্দ বললে শুনো না সে সব কানে,
মন্দ করলে নীরব থাকাই ভালো।

বিপদে চললে বাধা দাও যদি পার,
ক্ষমা সঙ্গত অনুচিত ব্যবহারে।

অভাবগ্রস্থ কে নয় দুনিয়া মাঝে,
কার দুঃখের প্রতিকার কে বা করে ?

সিকান্দারের অপটু দিশারী খাজা১২
আর কারে বল দিশারী আমার করি ?

হায়রে গালিব, আশাই যদি বা গেল,
কেন তবে আর অপরে মন্দ বলা ?

৪৫

বহুদিন হলো বন্ধু আমার
করেছিল ঘর আলো,

১২। ইসলামী সাহিত্যের মিস্টিক দিশারী খাজা খিজির। কথিত আছে, তাঁর নির্দেশেও বাদশা সিকান্দার আবে-হায়াতের তীরে পৌঁছাতে পারেননি।

সুরা-সঙ্গীতে জমেছিল আহা,
উতলা আসর ভালো।

আনছি আবার বিতত হৃদয়
দশ দিক হতে টেনে,
আহা, কতদিন ভুলে বসে আছি
আঁখির যাদু না জেনে।

নিশাস রুদ্ধ হয়ে আসে আজ
দীর্ঘ দিনের পরে,
বক্ষের বাস ছিঁড়েনিতো হায়,
বরষ বরষ ধরে।

অনলবর্ষী ক্রন্দন আজ
আবার তুলব আমি,
যুগ যুগ গেল, দীপালী শিখায়
জ্বলেনি আঁধার যামী।

আবার তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ঘায়ে
হৃদয় বিদারি' দিব,
হাজারো ব্যথার লবণের স্বাদ
ক্ষতের পরেতে নিব।

হৃদয় শোণিতে দৃষ্টি ডুবিয়ে
ভুরুর সীবনী ধরে,
আঁচলে গোলাপ ফুটন্ত কলি
এঁকে দিব থরে থরে।

দৃষ্টি ও মন প্রতিদ্বন্দ্বী
বহুদিন পরে আজ,

ছবি ও স্বপ্ন এনেছি খুজে গো
ঘুচাতে আলস লাজ।

আবার চলেছি প্রিয়ার দেশেতে
আকাঙক্ষা উঠে বেড়ে,
অভিমান আর অহঙ্কারের
স্বর্ণ দেউল ছেড়ে।

বাসনার চাই ক্রেতা যে বন্ধু
এতোদিন পরে তাই,
প্রাণ ও হৃদয় বুদ্ধি বিপনি
সাজিয়ে তুলতে চাই।

আবার রূপের পিপাসা জাগছে
মনের গহনে আহা,
শত ফুলবন বিকশি' উঠছে
নয়ন সম্মুখে আহা!

হৃদয় বানের লিপি ফের খুলি,
চাইছে আমার মন,
ভূমিকায় তরে বিলাতে এ প্রাণ
অধীর প্রতিটি ক্ষণ।

দু'চোখ আবার চাইছে কারেও
উদিত প্রাসাদ পরে,
চাঁদ মুখে যার কালো কুন্তল
ব্যাকুল রয়েছে পড়ে।

আবার নয়ন খুঁজে ফিরে এক
বসন্ত ঘন হিয়া,

সুরায় উতলা ফুলবন যেন
রঙীন মুখ সে প্রিয়া।

সেই অবকাশ চাই যে আবার
সেই সে রাত্রিদিন,—
প্রিয়ার ধ্যানেতে বসে আছি করে
আগামী অতীত লীন।

গালিব, আমারে জ্বালিও না, শোন
তাহলে আঁখির জল,
তুলবে তুফান, ডুবাবে তোমার
সকল অচলাচল।

৪৬

পুবের দুয়ার খুলল সকাল বেলা,
বিশ্ব উজল সূর্য বেরিয়ে এলো।
দিনপতি এসে সকলি যে নিয়ে নিলো
ছিল রাতভর যতনা মানিক মেলা।

ভোজবাজী যেন কোথায় মিলাল সব,
আকাশে নেইতো রাতের কাহিনী আঁকা।
তাহারা আসলে যা দেখি তেমন নয়,
ধোকা দেয় তা'রা বাজীকর যেন পাকা।

আকাশ আগুনে পড়েছিল রাতে খোলা,
দামী মুক্তার কত না গহনা ভার।
ভোর বেলা দেখি পূবেতে সরায়ে চুল
আগুন বরণী প্রিয়া যে ঘোমটা খুলে।

আরেকটু গেল এগিয়ে, প্রভাত বেলা,
গোলাপী সুরায় আকাশ রঙীন হোল।
এ সুরা রাতের জড়তারে দূর করে,
রেখে গেছে তাই সাকী কোন্ ভোর বেলা।

শাহী মহলের দরবার বসে ওই,
শান্তি ও সুখ ধরায় আসছে নেমে।
বাদশার মাথে সোনার মুকুটখানি,
তপন চেয়েও উজল মোহন রূপ।

বাহাদুর শাহ হৃদয় উজল তাঁর,
জীবনের মানে তাঁর কাছে অবারিত।
সেই যিনি যাঁর জন্মের ইতিহাসে
সপ্তাকাশের তারার সৃষ্টি লেখা।

সেই যিনি যাঁর নিপুণ পারগ হাতে
নবীর হুকুম অবাধে তামীল হয়।
সিপাহী শান্ত্রী কতনা রয়েছে তাঁর,
একেকটি যেন প্রাচীন ইরানী রাজা।

পারিষদ তাঁর অতুল দুনিয়া মাঝে
ওই যেন সব সীজার রয়েছে খাড়া।
বাদশার সেই অশ্ব তুলনাহীন
বায়ুগতি টগবগে আলীশান—

পায়ে পায়ে তার কত না চিত্র ফুটে,
মূরতশালা কি আযরের[১৩] গেল খুলে?

১৩। হজরত ইব্রাহীমের পিতা আযর ছিলেন বিখ্যাত মূর্তি নির্মাতা। কথিত আছে, তাঁর মূর্তিশালায় অনেক সুন্দর সুন্দর প্রতিমা রক্ষিত ছিল।

বাদশার দেওয়া শিক্ষা পেয়েছি আমি,
রহস্য তাই জেনেছি চাঁদ তারার।

চিন্তায় ছিল কত না গ্রন্থি বোঁজা।
তাঁরি শিক্ষায় সকলি গিয়েছে খুলে।
হৃদয়ের মুখ বন্ধ, পরশে তার—
(আহা) খুলল কখন কেমনে, তাও না জানি।

বাদশা যখন হেসে বলবেন কথা
তখনি মধুর বসন্ত দিব খুলে,
প্রতিটি নিশাসে ফুলের গন্ধ পাবে
গানের কলিরা যখনি উঠবে বেজে।

৪৭

আহা, বসে আছি পিঞ্জর কোণে
দু'পাখা রেখেছি মেলে,
খাঁচার দুয়ার খুলত যদি গো,
বনেতে যেতাম উড়ে।

ডাক দিব গিয়ে, 'এসেছি আমি গো'
সে দিবে দুয়ার খুলে,
আহা , যদি হোত তেমন যাওয়াটি
সুদূর প্রিয়ার পুরে !

আমি ভাবি, শুধু গোপন কথাটি
বন্ধু আমারে বলে,
জানি না তো হায়, দুশমন সেও
আমারি ভাগ্য পাবে !

হৃদয়ে বিরহ কালিমা যখন
লেগেছিল তলে তলে,
তখন কি জানি আগুনে সে-দাগ
দ্বিগুন মোহন হবে ?

রাখুক সে খুলে ভুরুর ধনুটি
কিছু না আসবে তাতে,
ভঙ্গিটি তার তেমনি করে যে
ঘায়েল করবে মোরে।

দিশারী তুমি কি ? চল তবে ভাই,
সাথী হবে তাও ভালো ;
পথে যেতে দেখি সেই দিশাহারা
পথের চিহ্ন কালো।

হৃদয়ের জ্বালা চোখের জলেতে
কভু কি শীতল হয় ?
ধরলে বৃষ্টি দ্বিগুণ গরমে
ধরণী তাপিত হয়।

লিপি যেই এলো সাথে এলো তার
মৃত্যুর পয়গাম,
রইল লিপিকা, ঘনিয়ে এলো যে
শেষের নিশীথ যাম।

বন্ধু, জেনো গো, গালিবের সাথে
প্রীতিযোগ আছে যার,
গোপন ঋষি সে, বাইরে কেবল
কুফরী মুখোশ তার।

৪৮
সত্যি ঘটনা বলার প্রয়াস
তাই এ-কবিতা লিখা,
বাহাদুরী কিবা নিজের তারীফ
আমার বাসনা নয়।

শ'পুরুষ ধরে জাত ব্যবসা তো
সৈন্য সেনানী চালা,
কবিত্ব কিছু আমার পক্ষে
গর্ব করার নয়।

অন্তরে আমি মুক্ত, সবারে
বন্ধু বলেই ভাবি,
কারো সাথে কভু শত্রুতা করি
এমন ইচ্ছা নেই।

কম কথা নয়, জাফর শাহের
ভৃত্য হয়েছি আমি,
মানলাম, ধন বিত্ত বেসাত
কিছুই আমার নেই।

বাদশার গুরু তাঁর সাথে কি গো
দ্বন্দ্ব আমার সাজে?
এমন বেতাল বেয়াড়া বেকুফ
এখানে তো কেউ নেই।

বাদশার হৃদি উজল আয়না
জাম-জামশেদ[১৪] মতো,

১৪। কবি-প্রসিদ্ধি আছে যে, প্রাচীন ইরানের বাদশা জামশেদের পানপাত্রে বিশ্ব প্রতিফলিত হোত।

সাক্ষী সাবুদে প্রয়োজন তাই
কখনো সেখানে নেই।

কোথায় উর্দু কোথা আমি আর
কি আমার প্রয়োজন ?
কবিতা লেখা সে মন ভোলানোর
বাতিক ছাড়া তো নয়।

বিয়ে উপহার[১৫] লিখেছি কেবল
হুকুম তামিল ছলে,
শাহের ইচ্ছা অপূর্ণ রবে
এমন কি কভু হয় ?

শেষের চরণে এসেছিল তার
হয়ত বা কটু ভাষা,
সত্যি বলছি, কারো প্রতি সে যে
কটাক্ষ কভু নয়।

ভাগ্য হয়ত মন্দ আমার,
স্বভাবে তেমন নই,
নসীবের লাগি শেকায়েত করি
এমনো ইচ্ছা নয়।

মিথ্যা বলে না গালিব কখনো
সাক্ষী স্বয়ং খোদা,

১৫। জনৈক শাহজাদার বিবাহোপলক্ষে যে 'সেহরা' (বিবাহ উপলক্ষে প্রশংসা ও বর্ণনা সূচক কবিতা) গালিব লিখে-ছিলেন, তাতে বাদশার কবিগুরু জওকের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ইঙ্গিত ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।

সত্য বলে সে, মিথ্যা বলার
স্বভাব যে তার নয়।

৪৯

রোযা খুলে যার খাওয়ার মতন
সন্ধ্যায় কিছু থাকে,
অবশ্য তার পক্ষে 'সিয়াম'
'ফরয' আদেশ রাখে।

যার কিছু নেই খাওয়ার মতন
ইফ্‌তারে রোযা খুলে,
সে বেচারা যদি রোযা নাই খাবে
কি দিবে উদরে তুলে?

৫০

তখ্‌ত তোমার আকাশ সমান
দিল্লী শাহান শাহ,
শাসন তোমার সূর্য স্বরূপ
জীবন স্বরূপ আহা!

ছিলাম আমি তো দরিদ্র এক
গৃহকোণে সমাসীন,
ছিলাম হৃদয় অনুভূতি নিয়ে
একান্তে হয়ে লীন।

তুমিই আমারে দিলে সম্মান
বাইরে লোকের মাঝে,

জীবনে আমার দিলে কোলাহল
সাজালে এমন সাজে !

আমার মতন অণু তাই হোল
আকাশে চন্দ্র তারা,
আমার মতন গুম্‌নাম হোল
প্রকাশে সূর্য পারা।

কৃতার্থ আমি পেরেছি হোতে যে
তোমার বিনত দাস,
কৃতজ্ঞ পেয়ে তোমার মুখের
বদান্যতার হাস।

তোমারী গৃহের চিরাধীন দাস
বন্দনা অনুরত,
চিরদিন করি হুকুম তামীল
নিতান্ত অনুগত ।

তোমার সকাশে মনের বাসনা
যদি না প্রকাশ করি,
কা'র কাছে তবে আরয আমার
প্রার্থনাকারে ধরি।

হে গুরু, বাদশা মোর্শেদ তুমি
আর কেহ গুরু নেই,
করছি শপথ, উষ্ণীষ তাজে
আমার যে লোভ নেই।

শীতের কালেতে তবু তো হুযুর,
কাপড় কিছুটা চাই।

হিম শীত বায়ু তাড়না সইতে
কিছুটা আড়াল চাই।

পোষাকে আমার প্রয়োজন, সেতো
নিতান্ত সোজা কথা,
হোক নাক ক্ষীণ তনু, তবু তার
আছে সুখ দুখ ব্যথা।

এ-বছরে কিছু কিনি নাই প্রভু,
যাইনি বিপণি পথে,
এবারের কথা কি বলি হুযুর
চলে না কোনই মতে।

রাতে বসে বসে আগুন পোয়াই—
দিনে তপনের তাপ,
এমন দিবস রাত্রি আমার
যায় তো চুলোয় যাক।

কত আর লোক আগুন পোয়ায়
কত পারে তাপ স'তে—
হে খোদা বাঁচাও জাহান্নামের
আগুনের ভয় হতে।

আমার মাসিক মাসোয়ারা প্রভু
যেটুকু ধার্য আছে,
সেটুকু পাওয়ার আজব রীতি যে,
তাই তো আরয আছে।

মুর্দার হয় ছ'মাসী হুযুর,
একথা সকলে জানে,

আমি বেঁচে তবু ছ'মাসী, হায় রে,
আমারে যে গোরে টানে।

এই সে কারণ প্রতিমাসে প্রভু,
ধার করে করে খাই,
মহাজন তার সুদের দাবীতে
গুণে নেয় প্রতি পাই।

আমার মাসিক বেতনে যে তার
তৃতীয়াংশের দাবী
দাঁড়িয়েছে তাই—মহাজন কাছে
বাঁধা যে ঘরের চাবি।

আমার মতন কবি আজ নেই
ভূ-ভারতে কোনখানে,
এমন বাণীর উৎসার কেউ
দেখেনি, শোনেনি কানে।

গূঢ়ার্থ আর মরমীয়া বাণী
শুনতে যদি গো চান,
কবিতার মুখে নীরবে তাহলে
পাতুন অবাক কান।

আসর উজল গীতিকার শোভা
দেখতে প্রয়াস যদি,
মনি ও মুক্তা ছড়াবে কলম
অগণন নিরবধি।

বড়ই জুলুম হবে যদি আজ
কবি না আদর পায়,

স্বীকৃতি আমি না পেলে হযুর
প্রলয় হবে যে হায়।

আপনার দাস উলঙ্গ রবে
লজ্জা কি তাতে নয়?
আপনারি দাস ধার করে খাবে
এ কেমন করে হয়?

আমার বেতন করুন হযুর
ছ'মাসী বদলে মাসে,
ফলে জীবনের দিনগুলো যেন
সহনীয় হয়ে আসে।

শেষ করি কথা দোআ দিয়ে প্রভু
রীতির বাঁধন যাক,
কবিত্বে নেই প্রয়োজন, সাদা
কথারি গাঁথুনি থাক।

বেঁচে থাক প্রভু, হাজার বছর
প্রতিটি বছরে দিন
পঞ্চ হাজার দশেক করে গো,
আল্লাহ তোমারে দিন।

পরিশিষ্ট

গজল—ইকবাল, আধুনিক কবিগণ ও নজীর আকবরাবাদী 'নযম'-গুলোকে বাদ দিলে গজলই উর্দু-কাব্যের শতকরা আশি ভাগ জায়গা দখল করে আছে। উর্দু কাব্যে গজলের জনপ্রিয়তা অপরিসীম। মুশায়ারাগুলোতে গজলেরই আবৃত্তি চলে ও সেখানে কবি কর্মের উৎকর্ষ গজল দ্বারাই নির্ণীত হয়।

গজলের নির্মাণরীতি মোটামুটি নিম্নরূপ :

গজলে কমপক্ষে তিনটি *couplet* অর্থাৎ ছয়টি পংক্তি থাকতে হবে। বেশী কত থাকবে, তার কোন নিয়ম নেই। তবে গজল নাতিদীর্ঘ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গজলের প্রথম দুই পংক্তিকে 'মাত্‌লা' অর্থাৎ সূচনা বলা হয়। এই দুই পংক্তিকে 'রদীফ' ও 'কাফিয়া' দু'দিক দিয়েই সমিল হতে হবে। শেষ দুই পংক্তিকে বলা হয় 'মাকৃতা' বা উপসংহার। এই দুই পংক্তি সমিল হয় না; 'মাতলা' ছাড়া গজলের অন্যান্য *couplet*-এর মতোই দ্বিতীয় পংক্তিতে মিলের পুনরাবৃত্তি হয় ও পূর্ণ যতি পড়ে। 'মাকৃতায়' কবির ভণিতা থাকারও নিয়ম আছে। গজল কণ্ঠ অথবা যন্ত্র সহযোগেও গীত হয়।

গজলে পংক্তি যতগুলোই থাকুক, তার প্রতি দুই পংক্তিতে একটা ভাবের ও বক্তব্যের সমাপ্তি ঘটে। রুবাঈতে যেমন চার পংক্তি একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র *unit*, গজলেও তেমনি দুই পংক্তি একটি সুসম্পূর্ণ *unit*। গোটা গজলে ভাবের একটা অনুরণন থাকতে পারে; কিন্তু রীতির দিক থেকে তা অপরিহার্য নয়। আমাদের মনে হয় ভাবের এই অনুরণন 'রদীফের' অন্তর্গত শব্দ ও শব্দযূথের পুনরাবৃত্তির দরুণই হয়ে থাকে। অবশ্য কবির মনের *sequence*-বোধের একটা ক্ষীণ সূত্রও তাতে কাজ করে।

গজল শুধু গাওয়াই হয় না, আবৃত্তিও করা হয়। যদি সুরে গীত হওয়াই গজলের একমাত্র উদ্দেশ্য হোত, তবে তাতে ছন্দের বন্ধন এতো পাকা করার প্রয়োজন থাকত না। কিন্তু গজলের ছন্দ বন্ধন অতিশয় পাকা ও নির্দিষ্ট। ছন্দের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই গজল গীতিকা না হয়ে গীতি কবিতা হয়েছে। প্রতি দুই পংক্তিতে ভাবের নতুন নতুন সূচনা হয় বলে গজলে কবি চিত্তই প্রধান। এটিও গীতি কবিতার এক প্রধান লক্ষণ।

উর্দু গজল ফারসী গজলেরই অনুরূপ। গজলের উৎপত্তি প্রথম কোথায় হয়েছিল, তা নিয়ে মতভেদ আছে। মাননীয় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ গজলের দুই পংক্তির বৈশিষ্ট্য ও ভণিতার রীতি দৃষ্টে তাকে বৌদ্ধগান ও দোঁহার সন্ততি বলে মনে করেছেন।

উর্দু গজল লিখিয়েদের মধ্যে ক্লাসিক্যাল যুগের মীর তকী ও গালিব প্রধান। আধুনিক যুগে ইকবালও উৎকৃষ্ট গজল রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে জিগার মুরাদাবাদী ও ফয়েজ আহ্মদ ফয়েজের নাম ও করা যেতে পারে।

কাসীদা—গজলের মতো উর্দু কাসীদাও ফারসী কাসীদারই অনুকরণ ও অনুসরণ। ফারসীতে কাসীদার প্রচলন হয়েছে স্পষ্টতঃই আরবী থেকে। গজলে যেমন কবি চিত্তের ভাবনাই প্রধান, কাসীদায় তেমন নয়; কাসীদার কাব্য রীতি অনেকটা বস্তু নির্ভর বা *objective*। তবে বক্তব্যের প্রকৃতি ভেদে তাতে গীতি কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য এসে যাওয়াও দোষের বলে গণ্য নয়।

কাসীদা প্রধানতঃ কোন ব্যক্তির বা মহৎ বস্তুর স্তুতি-মূলক বর্ণনা। ফারসী ও উর্দু কাসীদার উৎপত্তি ও বিকাশ

রাজতন্ত্রের যুগে হয়েছিল বলে, সেগুলোতে রাজপুরুষদের স্তুতিই বেশী উচ্চারিত হয়েছে।

গালিব উর্দুতে কাসীদা লিখেননি বললেই চলে। কারণ, তাঁর কবি প্রকৃতি কারো স্তুতিগান উচ্চারণ করার অনুকূল ছিল না। তবে কাসীদার কবি কর্মে অবাধ কল্পনা বিস্তারের যে অবকাশ আছে, তা গালিবকে উৎকৃষ্ট ফারসী কাসীদা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। আধুনিক কালে কাসীদা কেউ বড় একটা লেখেন না।

কাসীদা কমপক্ষে পনর *couplet* বা ত্রিশ পংক্তির হতে হতে হবে। উর্ধ্বপক্ষে কত বড় হবে তার কোন নিয়ম নেই তবে কাসীদা বেশ বড়ই হয়ে থাকে। গজলের মতো কাসীদারও দ্বিতীয় পংক্তিতে 'রদীফ'-'কাফিয়া,র মিল থাকবে কিন্তু তাতে 'মাত্‌লা' বা 'মাকতা' থাকবে না।

মসনবী—মসনবী বড় কাব্যের উপযোগী ছন্দরীতি। মহাকাব্য থেকে শুরু করে বর্ণনামূলক কাব্য, দর্শনকাব্য, ধর্মীয় কবিতা সব মসনবী রীতিতে রচিত হয়।

মসনবীর পংক্তিগুলো সমিল হওয়ার নিয়ম। কিন্তু তাতে 'রদীফের' পুনরাবৃত্তি থাকবে না। মসনবীর রীতিটি অনেকটা বাংলা পয়ারের অনুরূপ, কিন্তু পয়ারের মতো তার ছন্দ পদভিত্তিক নয়, পর্বভিত্তিক।

মসনবীও অন্যান্য উর্দু পদ্যরীতির মতো ফারসী থেকেই গৃহীত। ফিরদৌসীর 'শাহ্‌নামা,' নিজামীর 'সিকান্দার নামা' ও রুমীর 'দর্শনকাব্য'টি মসনবী রীতিতে রচিত। গালিব ফারসীতে অনেক মসনবী রচনা করেছেন কিন্তু তাঁর উর্দু দীওয়ানে মসনবীর একটি মাত্র নিদর্শন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ইকবাল উর্দুতে 'সাকীনামা' প্রভৃতি কবিতা মসনবী রীতিতে রচনা করেছেন। তাঁর ফারসী 'আসরারে খুদী' 'জাবীদনামা' প্রভৃতি কাব্যও মসনবী রীতিতে লেখা। 'মুসদ্দসে হালী'র রীতিও মূলতঃ মসনবী।

কাতা—এই রীতি সাধারণতঃ উচ্চ কবি কল্পনা ও গভীর অনুভূতির বাহন নয়।

কাতাকে কমপক্ষে দুই *Couplet* বা চার পংক্তির হতে হবে। উর্ধ্বে পংক্তিসংখ্যা কত হবে তা নির্দিষ্ট নয়। কাতায় একটি কথাই গোটা কবিতার বিষয় বস্তু হয়। ছন্দরীতি গজলেরই অনুরূপ, তবে তাতে 'মাত্লা' কিংবা 'মাক্‌তা' থাকে না।

গালিব উর্দুতে কিছু কাতা রচনা করেছেন।

রুবাঈ—অন্যান্য কাব্যরীতির মতো রুবাঈও ফারসী থেকেই উর্দুতে আমদানী হয়। শ্রেষ্ঠ ফারসী কবি ওমর খৈয়ামই উর্দু রুবাঈর আদর্শ।

রুবাঈ চার পংক্তির কবিতা। গজলে যেমন দুই পংক্তিতে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা, রুবাঈতে তেমনি চার পংক্তিতে।

রুবাঈর প্রথম পংক্তি দুটো সমিল অর্থাৎ একই 'কাফিয়া' যুক্ত। তৃতীয় পংক্তি স্বাধীন, আবার চতুর্থ পংক্তিতে প্রথম পংক্তির কাফিয়ার পুনাবৃত্তি।

গালিব কিছু কিছু উর্দু রুবাঈও লিখেছেন। কিন্তু সেগুলোতে তাঁর বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন তেমন কিছু হয়নি বলে দীওয়ানের অনুবাদে রুবাঈ গৃহীত হয়নি।

নযম—বাংলায় আমরা যাকে 'কবিতা' বলি, উর্দুতে তাকেই

'নয়ম' বলা হয়। 'নযম' বাংলার গীতি-কবিতা ও ইংরাজীর *lyric* রীতির প্রতিরূপ। উর্দুর ক্লাসিক্যাল যুগে একমাত্র নযীর আকবরাবাদী 'নযম' রচনা করে গেছেন। এই রীতি সে-যুগে আর কেউ গ্রহণ করেননি। গালিবও কোন 'নযম' রচনা করেননি।

উর্দুতে হালী ও ইকবালই হয়তো 'নযম' রীতির শ্রেষ্ঠ কবি। সাম্প্রতিক কালে জোশ মলীহাবাদী ও ফয়েজ আহ্‌মদ ফয়েজও শক্তিশালী 'নযম' রচনা করেছেন।

উর্দু 'নযম' প্রধানতঃ সমিল। ইদানিংকালে পরিচিত মৌলিক ছন্দছাড়া গদ্যেও নযম রচনার রীতি জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

উর্দু কবিতার ছন্দ— দ্বিচরণের পদবদ্ধ উর্দু কবিতায় ছন্দের প্রথম বিশেষত্ব। ফারসীরও তাই। উর্দু কবিতার সকল অলঙ্কারের মতো ছন্দালঙ্কারও যে পুরোপুরিই ফরাসী থেকে আহৃত তার প্রমাণ স্বরূপ কবি পরিচিতির দ্বিতীয় অংশে আমীর খসরুর লেখা প্রাথমিক যুগের উর্দু গজল রীতির উদাহরণে দ্বিচরণযুক্ত পদবন্ধের প্রথম ফারসী চরণের সঙ্গে দ্বিতীয় উর্দু চরণকে কিভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছে, তা দেখিয়েছি। এই দ্বিচরণের চাল কি গজল, কি মসনবী—সর্বত্র।

দ্বিচরণযুক্ত পদবদ্ধ বলতে যে শুধু সমিল *couplet*-ই বোঝায় তা নয়; পূর্ণ বিরাম বা যতিই সেই পদ বন্ধের লক্ষণ। রুবাঈর নির্মাণে পদবদ্ধ (*stanza*) চার চরণের হলেও যতির বেলায় বৈলক্ষণ্য নেই। সেখানে অর্থের দিক থেকে চার চরণযুক্ত পদবন্ধ স্বীকার করে নিলেও ছন্দের দিক থেকে তাকে দ্বিচরণযুক্তই মনে করতে হবে।

দ্বিচরণের এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখলেই উর্দুতে গজলের প্রাধান্য কেন হোল, তা বুঝতে পারা সহজ হবে। আমরা 'কবি-পরিচিতি'তে বলেছি যে, গজল বাঙালী পাঠকের কাছে কিছুটা অদ্ভুদ ঠেকবে, কারণ তাতে আগা-গোড়া ভাবের একটা মিল নেই। দুই পংক্তির প্রতিটি জোড়ায় ভাবের নতুন নতুন বিন্যাস ও বৈলক্ষণ্য। গজলের এই বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে ছন্দেরই প্রভাব। ছন্দের দ্বিচরণ চালের সঙ্গে সমতা রক্ষা করতেই যেন ভাব ও অর্থের সঙ্কোচন দুই পংক্তির কাঠামোর মধ্যে করা হয়েছে। এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই গজল-গীতি উর্দু কাব্যের সব-চাইতে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত কাব্য রীতিতে পরিণত হয়েছে। এই জন্যই আদিযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল সময়ই গজলের জনপ্রিয়তা উর্দু কাব্যে সর্বাধিক রয়েছে।

মুসাদ্দাস (ছয় চরণের পদবন্ধ) ও মুখাম্মাস (পাঁচ চরণের পদবন্ধ) দীর্ঘ কবিতায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেখানেও ছন্দের চাল সেই দ্বিচরণের। মুসাদ্দাসে তো কথাই নেই মুখাম্মাসও পঞ্চম চরণ পদবন্ধটির পুচ্ছ হিসাবেই প্রথম চার চরণের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

পদবন্ধের পরেই চরণ মধ্যস্থ পর্বভাগের কথা আসে। ছন্দের মৌলিক ভাগ এই পর্ব। পর্বের বৈচিত্র্য থেকেই ছন্দের বৈচিত্র্য। উর্দু কবিতায় চরণের পর্বভাগ ফারসী কবিতারই অনুরূপ। মাত্রায় সমতা ও ঝোঁকের উপর ভর করেই এর ছন্দ আবর্তিত হয়। উর্দু কবিতায় ছন্দকে 'বহর' বা তরঙ্গ বলা হয়ে থাকে। নামটি সার্থক। কারণ সমমাত্রায় এই পর্বগুলো তরঙ্গের মতোই গড়িয়ে চলে ও চাল ও চরণের শেষে খণ্ডপর্বের তটে এসে প্রতিহত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ নীচে দুটো চরণের মাত্রা বিশ্লেষণ করে দেখানো হোল।

বাহ্‌রে জুলমাত মেঁ দৌড়া দিয়ে ঘোড়ে হম্‌নে
(ইকবাল)

পর্ব ভেঙে নিলে দাঁড়ায়ঃ

বাহ্‌রে জুলমা ০ ত মেঁ দৌড়া ০ দিয়ে ঘোড়ে ০ হম্‌নে
এখানে তিনটি পূর্ণ ও একটি খণ্ড পর্ব। আরবী ছন্দশাস্ত্রের ছক অনুযায়ী এটি ঃ

ফাইলাতুন ০ ফাইলাতুন ০ ফাইলাতুন ০ ফেলুন—এই কাঠামোতে পড়ে।

পর্বভিত্তিক এই উর্দু ছন্দে খণ্ডপর্বটির ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এর সামান্য পরিবর্তনেই ছন্দে প্রচুর বৈচিত্র্য এসে যায়। যেমন ঃ

নাহী মিন্নাত কশে তাবে শানিদান্দ দাস্তাঁ মেরী
(ইকবাল)

পর্ব ভাঙলে দাঁড়ায় ঃ

নাহী মিন্নাত ০ কশে তাবে ০ শানিদান্দ ০ দাস্তাঁ মেরী।
এখানকার ছকটিও আগের মতোই, শুধু খণ্ডপর্বে একটু তফাৎ; যথা, ফাইলাতুন ০ ফাইলাতুন ০ ফাইলাতুন ০ ফাইলন।

অথচ শুধু খণ্ডপর্বটির একটু পরিবর্তনের দরুণ গোটা ছন্দটিতেই প্রচুর বৈচিত্র্য এসে গেছে।

এইরূপ ছক অনুযায়ী উর্দু কাব্যে মোট আটটি মূল ছন্দ আছে। এবং সেগুলোতে শুধু খণ্ডপর্ব ও পর্ব মধ্যস্থ

একটি অথবা দুটো ঝোঁকের একটু আধটু পরিবর্তন দ্বারা অসংখ্য ছন্দবৈচিত্র্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

বাংলা ছন্দের পরিভাষায় উর্দূর গোটা ছন্দরীতিকেই আমরা মাত্রাভিত্তিক বলে অভিহিত করতে পারি। আধুনিক কাল পর্যন্ত এই মাত্রাভিত্তিক ছন্দরীতিই উর্দূ কাব্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

গ্রন্থ-পঞ্জি

১। ইয়াদগারে গালিব—আলতাফ হোসেন হালী।
২। হায়াতে গালিব—শেখ মুহম্মদ ইকরাম।
৩। মুহাসিনে কালাম-ই-গালিব—ডক্টর বিজনৌরী।
৪। Ghialib: His life & Persian Poetry
Dr. Arif Shah C. Syyid Gilani
৫। ইর্তিকায়ে আদাবে উর্দূ—ডক্টর শওকত ফরজ্ওয়ারী।
৬। তারীখে আদাবে উর্দূ—সৈয়দ এজাজ হোসেন।
৭। মাকাতিবে গালিব—ইম্তিয়াজ আলী আরশী।
৮। বাঙ্লা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড—ডক্টর সুকুমার সেন

IFP : 80-81 : P/2529/5250/30-8-80